

উদ্ভাদ নোমান আলী খান

বিভাহিত ইস্ৱার হাৰ্ট

অনুবাদ

মারদিয়া মমতাজ



রিভাইভ ইয়োর হাট

উস্তাদ নোমান আলী খান



গার্ডিঘান

পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

আমরা এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি। প্রতিযোগিতার নামে ব্যক্তিস্বার্থের দাস হয়ে পড়ছি। আমাদের অন্তর মরে যাচ্ছে। আত্মার বন্ধন ধীরে ধীরে ছিঁড়ে যাচ্ছে। নফসের গোলামি করতে গিয়ে নিজেদের মতো একটা চিন্তা-দুনিয়া তৈরি করছি, যেখানে আমরা আত্মপক্ষের সমর্থনে ওকালতি করি আর অন্যের ব্যাপারে বিচারকের ভূমিকায় পৌঁছে যাই। ন্যায়-অন্যায়ের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করতে পারি। পার্থিব মোহে আখিরাতকে খুব অল্প দামে বেঁচে দিতে পারি। যেকোনো মূল্যে এই দুনিয়ায় আমরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাই, অনেক কিছু পেতে চাই। অথচ আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এক আল্লাহর সীমারেখার মধ্যেই অবস্থান করব। কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মহান প্রভুর ওপর আস্থা রাখব।

উস্তাদ নোমান আলী খান মুসলিম হৃদয়ের এসব অব্যক্ত কথামালা প্রকাশ করেন অত্যন্ত সাবলীল ভাষায়। তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন দায়ি ইলাল্লাহ। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা Kube Publishing Ltd. নোমান আলী খানের কিছু বক্তৃতা ‘Revive Your Heart : Putting Life in Perspective’ নামে সংকলন করেছে। একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কিউব পাবলিশিং লিমিটেড-এর বেশ কয়েকটি বই গার্ডিয়ান পাবলিকেশন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবে ইনশাআল্লাহ। এই চুক্তি অনুসারে ‘Revive Your Heart’ বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রথম পরিবেশনা।

আমি বিনয়ের সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিতা বোন মারদিয়া মমতাজ-এর প্রতি। তিনি সাংসারিক ও পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও বইটির প্রাণবন্ত অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বোনকে উত্তম প্রতিদান দিন। বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একুশে বইমেলায় ঘোষিত সময়ের মধ্যে বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে গার্ডিয়ান পরিবার অনেক রাত নিঘুম কাটিয়েছে। সহকর্মীদের প্রতি অনেক ভালোবাসা।

বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ একটি ভালো বই হাতে পেতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯



KUBE PUBLISHING LTD
MCC, Ratby Lane, Markfield,
Leicestershire, LE67 9SY, UK

T: +44(0)1530 249230

F: +44(0)1530 249 656

E: info@kubepublishing.com

W: www.kubepublishing.com

22nd April 2019

To Whom It May Concern

This is the certify that kube Publishing Ltd, UK, published Nouman Ali Khan's book *Revive Your Heart: Putting Life in Perspective*.

Kube Publishing Ltd has given Guardian Publication based at 34, North Broock Hall Road, Banglabazar, Sutrapur, Dhaka the exclusive worldwide right to publish *Revive Your Heart* in the Bangla language.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haris Ahmad', with a stylized flourish at the end.

Haris Ahmad
Director

অনুবাদকের কথা

উস্তাদ নোমান আলী খানের বাছাইকৃত বক্তব্যের সংকলন ‘Revive Your Heart : Putting Life in Perspective’ বইয়ের অনুবাদ পাঠকদের হাতে পৌঁছতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। ২০১৮-এর এপ্রিলে যখন গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর পক্ষ থেকে এই গ্রন্থের অনুবাদের ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়, আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এই অসিলায় অন্তত বইয়ের কাছে থাকতে পারব। কিন্তু সন্দিহান ছিলাম আমার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য নিয়ে। কারণ, সংসার এবং চাকরির নিত্য-নৈমিত্তিক চাহিদা সামাল দিয়ে টেবিলে বসার সময় পাওয়া যায় খুব কম। সেখানে এরকম একটা কাজ, যেখানে পূর্ণ মনোযোগ, অখণ্ড সময়, নিশ্চুপ পরিবেশ— সবই একসঙ্গে প্রয়োজন, সেটা সমাধা করা প্রায় অসম্ভব। যার কারণে মূল বই যেখানে পড়ে ফেলা যেত পনেরো দিনে, সেখানে অনুবাদের কাজ করতে সময় লেগে গেলো প্রায় দশ মাস। তবুও গার্ডিয়ান হতাশ হয়নি; বরং একটু একটু করে অনুরোধের সুরে তাগাদা দিয়ে আমার অপচয়ের সময়গুলোকেও টাইপের খটখট শব্দে ব্যস্ত রেখেছিল। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ এমন একটি টিম-এর সঙ্গে কাজ করতে পেরে।

বইয়ের প্রধানত পাঁচটি অংশ— দুআ, একটি সক্রিয় মুসলিম কমিউনিটি, আমরা কীভাবে উপার্জন করি, কিছু সমসাময়িক বিষয় এবং আখিরাত, জীবনযাপনের মূল লক্ষ্য। কোনটায় কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার সারমর্ম দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। পাঠক নিজেই পড়বেন আর জানবেন। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে একটিই কথা যা উস্তাদের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি লেখা পড়ার পর আমারও মনে হয়েছে। সেটা হলো, এই একই শিরোনাম কিংবা আয়াতটি আমি হয়তো নিজেও অনেকবার ভেবেছি, অনেক বইয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁর কথায় বিষয়টিকে একেবারে নতুন এক আঙ্গিক থেকে আবিষ্কার করা যায়। মনে হয় যেন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একবারও ভেবে দেখিনি। হলফ করে বলতে পারি, প্রত্যেক পাঠকের এই কথাটা মনে হবে। সাথে সাথে কুরআনের প্রতি এক অনির্বচনীয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পাঠক জানতেও পারবেন না— তিনি ডুবে যাচ্ছেন আল্লাহকে ভালোবাসার আবেগে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে পুরো বইয়ে যতবার দরুদ আছে, প্রতিবার পুরোটা লিখেছি, সাথে সাথে দুআ করেছি তাঁর জন্য। একবারও সংক্ষেপ করে টাইপ করিনি। এই ক্ষুদ্র ভালোবাসাটুকু আল্লাহ তায়ালা যথাস্থানে পৌঁছে দিন।

এখানে একটা কৈফিয়ত দেওয়া জরুরি। জনাব নোমান আলী খান কথা বলেন বৈঠকি ধরনে, তাঁর মুখভঙ্গি, হাতের নড়াচড়া, স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান সর্বোপরি ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ আলোচনা সব মিলে তাঁর কথাগুলোকে একটি অসাধারণ ব্যঞ্জনা দেয়। লেখায় সে ব্যঞ্জনা ধরে রাখা অসম্ভব। আর

ভাষান্তরে সে ভাব আনার চেষ্টা করা দুরূহতম কাজ। শুরুতে এ নিয়ে খুব দ্বিধায় ভুগেছি। পরে নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে বাকিটা আল্লাহর রহমতের আশা করেছি। লেখার সকল দুর্বোধতা, অস্পষ্টতা, ভাব প্রকাশের দৈন্যের ভার একা আমারই। প্রায় প্রতিটা লেকচার খুঁজে বের করে দেখে নিয়ে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি, যেন যথাসম্ভব এ দূরত্ব ঘোচানো যায়।

সত্যি কথা বলতে হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক অপূর্ব নিয়ামত। আর হিদায়াত পাওয়ার পর তাকে ধরে রেখে সঠিক পথে পা চলা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। সঠিক এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস, আর যথাযথ অনুপ্রেরণা এই কঠিন কাজটাকে হাতের নাগালে এনে দিতে পারে। উস্তাদ নোমান আলী খান এখানে সেই চেষ্টাই করেছেন। বইটি পড়ে কারও একটি ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাতেও যদি পরিবর্তন আসে, তার বিনিময়ে ক্ষমাপ্রাপ্তদের তালিকায় আল্লাহ আমাকেও যেন शामिल রাখেন— এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যোগ্যতার বাইরে গিয়ে অনুবাদ করার সাহস করেছি।

বাচ্চাদের আর তাদের বাবার সাথে গল্প বলার, গল্প শোনার অনেকটা সময় এখানে দেওয়া আছে। আল্লাহ তাঁদেরকে এই ত্যাগের প্রতিদান দিন। শেষের দিকে এসে যখন অনেক বেশিই কষ্ট পাচ্ছিলাম, সময়মতো কাজ সমাধা করতে না পেরে, আমার আব্বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই কয়েকটি বিন্দ্রি রজনীর পুরস্কার আল্লাহর কাছে চেয়ে হাত তুলেছি। উপরন্তু যাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে কাজের কথা জেনে লাগাতার উৎসাহ দিয়েছেন, খবর নিয়েছেন, তাঁদেরকেও এই দুআয় शामिल রাখছি।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে কবুল করুন।

মারদিয়া মমতাজ

ঢাকা

৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

ভূমিকা

আজকের বিশ্ব বিরামহীন গুঞ্জে মুখরিত, সদা সক্রিয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিনোদন জগৎ, প্রযুক্তি এবং আরও হাজারো উন্নয়ন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিরন্তর প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। মুশকিলের কথা হলো, এসব আসলে আমাদের হৃদয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নিদারুণ প্রতিযোগিতায় মেতেছে। মুক্তবাজারের অবাধ চর্চার সঙ্গে আমরাও প্রতিনিয়ত ভোগের জন্য উৎসাহিত হচ্ছি। সূরা আত তাকাসুরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণিত ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে’, আর কখনো এমন বাস্তব হয়ে ধরা দেয়নি। এমন একটি সময়ে আমরা পদার্পণ করেছি, যখন আল্লাহর প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কাজটিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। যার অন্যতম প্রমাণ হলো বিনোদন মাধ্যম; আধুনিকতার নামে যা আমাদের ওপর জগদল পাথর হয়ে চেপে বসেছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়। আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাকেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভোক্তায় পরিণত করা হয়। আমাদের দ্বীনও এই ব্যবস্থাপনার প্রভাবে এক ধরনের বিনোদনধর্মী পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের দ্বিনি জ্ঞানে জ্ঞানী স্ফলাররাও যেখানে বিখ্যাত তারকা হয়ে উঠছেন। আমরা তাঁদের দেখে বিশ্বাসে উজ্জীবিত হই, আর তারপর আবার ফিরে যাই আমাদের রুটিনবাঁধা ভোগবাদী জীবনে। মুসলিম জাতি তাদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে এক সংকটময় সময় অতিক্রম করছে। তাদের বৈশ্বিক ভাবমর্যাদা ছিনতাই হয়ে গেছে কিছু হিংসাত্মক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে। এই গোষ্ঠী তরুণদের আকৃষ্ট করে, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভালোমতো জানে না। সংবাদের শিরোনাম কাঁপানো কাজে নিজেদের আধিপত্য দেখানোই তাদের কাছে মর্যাদার কাজ হয়ে গেছে।

এই উন্মত্ততা আর সংকট এখন এমন পর্যায়ে যে, বিশ্বাসের দিক থেকে এককেন্দ্রিক থাকা এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে। আমাদের সমাজ আর মসজিদগুলো আধ্যাত্মিক নির্দেশনা আর পরামর্শ আদান-প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন ‘আদ দ্বীন আন নাসিহাহ’— অর্থাৎ দ্বীন হলো ভালো পরামর্শ দেওয়া। সত্যি এটাই, এখন আমাদের মনও হয়ে গেছে বিক্ষিপ্ত, উদ্ভ্রান্ত। সুতরাং এই সয়ে যখন নেতিবাচক নেগেটিভ কথা ও কর্মের চর্চা ব্যাপকভাবে হচ্ছে, তখন ভালো এবং গঠনমূলক কথার প্রয়োজন আরও বেশি। যাতে আমাদের ঈমান সুন্দর থাকে, অটুট থাকে।

এই টালমাটাল সময়ে উস্তাদ নোমান আলী খানের ভালো কথাগুলোর সংকলন তরুণদের চিন্তাজগৎকে নাড়িয়ে দেবে। তিনি আমাদের হৃদয়ের ভাষায় কথা বলেন। তাঁর কথামালা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমাদের উৎসাহিত করে, আমাদেরকে জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। সমসাময়িক

সংস্কৃতি যখন আমাদেরকে বলে, ‘নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, এবং ভোগ করো, মৃত্যু হলো সবকিছুর শেষ।’ তখন আমাদের দ্বীন শেখায়, ‘মৃত্যু হলো আমাদের সত্যিকার জীবনের শুরু।’

এই সংকলনের মূল বিষয় হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে ফেরা। লেখক স্মরণ করিয়ে দিতে চান, আমরা যেন বাস্তবতার সঠিক ধারণাটি ভুলে না যাই। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ছোট জীবনটিই একটি ছোট সুযোগের জানালা খুলে দেয়। উত্তম কাজ করার মাধ্যমে সে জানালা দিয়ে অনন্ত জীবনের সবুজ মাঠে প্রবেশ করা যায়। আমাদের এসব কাজের ভিত্তিতেই আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেবেন, পরবর্তী জীবনে আমরা জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত কি না। লেখক একদম ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক জীবনাচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন পাঁচটি ভাগে। প্রতিটি ভাগে দু-তিনটি উপদেশ স্বরণ করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে প্রোথিত আচরণ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, গল্প করেছেন। ইবাদতের সময় কীভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, চারপাশের মানুষের সম্পর্কে কেন খারাপ চিন্তা করা অনুচিত ইত্যাদি যেমন আলোচনা করেছেন; একইসঙ্গে সামাজিক দোষত্রুটি, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও মহিলাদের প্রতি যে অসদাচরণ করা হয়, তা নিয়েও আলোকপাত করেছেন।

নিজ প্রতিষ্ঠান ‘বায়্যিনাহ’র মাধ্যমে উস্তাদ নোমান আলী খান একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি ‘বায়্যিনাহ’র মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কীভাবে মুসলিম চিন্তাবিদরা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের কথাগুলোকে পৌঁছে দিতে পারেন এবং আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে সব ধরনের মানুষের কাছে যেতে পারেন।

আমরা আশা করছি, এই লেখাগুলো মুসলিম জাতিকে আলোর উৎসরেখার সন্ধান এনে দেবে, মুসলমান হৃদয়ে নতুন এক ধরনের উৎসাহ তৈরি করবে। নিজেদের আত্মিক উন্নয়নের সাথে সাথে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং ঈমানদীপ্ত চেতনায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও ঢেলে সাজাতে সহায়তা করবে।

সম্পাদক

কিউব পাবলিশিং লিমিটেড

জানুয়ারি, ২০১৭

সূচিপত্র

দুআ : আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম	১১
বিপন্ন সময়ের দুআ	১২
দুআ ও হতাশা	২৩
একটি সক্রিয় মুসলিম কমিউনিটি	৪২
সমালোচনা	৪৩
অনুমান করা	৫৬
নেতৃত্ব	৬৫
আমাদের আর্থিক লেনদেন	৭৪
অর্থ উপার্জন	৭৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ণ	৮৪
কিছু সমসাময়িক বিষয়	৯২
কন্যাসন্তান	৯৩
প্যারিস ভাবনা : শার্লি হেবডো	১০৫
বাদ্যযন্ত্র শোনার বিপদ	১১৬
আখিরাত : যাপিত জীবনের মূল লক্ষ্য	১১৮
জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী	১১৯
ছোটো ছোটো পদক্ষেপ	১২৮
আখিরাত : সংক্ষিপ্ত কিছু কথা	১৩৯

প্রথম পর্ব

দুআ

আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম

বিপন্ন সময়ের দুআ

আমি সূরা আল ক্বাসাস-এর একটি আয়াত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাগুলো আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের বহু জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এ সূরায় আল্লাহর সাথে তুর পাহাড়ে সাক্ষাতের আগে তিনি যে জীবন অতিবাহিত করেছেন, সে ব্যাপারে কথা এসেছে। চলুন, এক নজরে দেখা যাক। তিনি তখন মিসর ছেড়ে মাদাইয়ানের পথে। ভুলক্রমে এক ব্যক্তিকে তিনি ঘুষি মেরেছিলেন, তাতে তার মৃত্যু হয়। মুসাকে পাওয়ামাত্র হত্যার আদেশ দেওয়া হয় লোকদের। নিজের শহর, এমনকী দেশ ছাড়লেন তিনি।

আল্লাহর সাহায্যে তিনি মরুভূমি পার হলেন, উপনীত হলেন মাদাইয়ানে। যদিও মাদাইয়ান মরুর মধ্যেই অবস্থিত, তথাপি সেখানে বেশ কিছু জলাশয়, যেমন, পুকুর, লেক ইত্যাদি ছিল। সুতরাং তিনি পানি পান করে স্বস্তি পেতে এবং একটু জিরিয়ে নিতে সেখানে থামলেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই ঘটনাটি বলেছেন এভাবে—

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ-

‘আর যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছলেন, দেখতে পেলেন, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দুজন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে।’ (২৮ : ২৩)

মুসা (আ.) দেখলেন, কিছু লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে, আর দুজন মহিলা নিজেদের পশু নিয়ে অপেক্ষায় আছে। সোজা কথায়, তারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের ভেড়াগুলো পানি দেখে অস্থির হয়ে গেছে, কিন্তু লোকের ভিড় ভদ্র মহিলাদ্বয়কে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ-

‘মুসা বললেন, “তোমাদের কী ব্যাপার?” তারা বলল, “আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ।”’ (২৮ : ২৩)

অর্থাৎ মহিলারা বলছেন, আজেবাজে লোকদের ভিড়ে গিয়ে তারা পশুগুলোকে পানি পান করাতে চান না। লোকগুলো তাদের অসম্মান করতে পারে। আর তাদের পিতাও কাজ করতে অসমর্থ, এ কাজ করার জন্য পরিবারে আর কেউ নেই।

মুসা আলাইহিস সালাম আর কথা বাড়ালেন না। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী মানুষ। তিনি মহিলাদের পশুগুলো নিয়ে কুয়ার কাছে গেলেন, লোকজনের ভিড় সরিয়ে সেগুলোকে পানি পান করালেন, এরপর এনে মহিলাদের হাতে ফেরত দিলেন। এখানে আমি এই আয়াতটি মনে করিয়ে দিলাম, যেন আমরা একই জায়গা থেকে চিন্তা শুরু করতে পারি।

فَسَقَى لَهُمَاءُ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ-

‘মুসা তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন। তারপর তিনি ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, “হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার মুখাপেক্ষী।” (২৮ : ২৪)

পশুগুলোকে পানি খাইয়ে তিনি ছায়ায় গিয়ে বসলেন। বসে কী করলেন? একটি দুআ পড়লেন। এটি কুরআনের একটি বিখ্যাত দুআ। তিনি চাইলেন, ‘হে আমার প্রভু, চলার পথে আপনি আমার জন্য যা-ই রেখেছেন, নিঃসন্দেহে আমার সেটারই প্রয়োজন।’ (২৮ : ২৪)

কী শক্তিশালী এই দুআ! এই দুআ আল্লাহ তাঁর কুরআনের অংশ বানিয়ে নিয়েছেন। এটা ছিল মুসার মন থেকে আসা একটি চাওয়া, একান্তে উচ্চারিত। তাঁর পেছনে লোকের ভিড় ছিল না, সমস্বরে আমিন বলার মতো অনুসারীর দল ছিল না। এ কেবল গাছের ছায়ায় বসে করা আল্লাহর এক বান্দার কৃতজ্ঞ উচ্চারণ। আল্লাহর কাছে এর মূল্য এত বেশি, কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে আমরা এই দুআ পড়তেই থাকব, স্মরণ করতে থাকব এই অনবদ্য শব্দগুলোকে।

খেয়াল করুন। যখন আপনি মানুষকে সাহায্য করছেন, আপনি তাদের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন না। কারণ, প্রশংসার আশায় আপনি সে কাজ করেননি। মুসা আলাইহিস সালাম যখন মেয়েদেরকে সাহায্য করলেন, কুরআনে বর্ণনানুসারে, মেয়েরা তাঁকে বলেননি, ‘আপনাকে ধন্যবাদ’। আবার মুসাও বলেননি, ‘আরে এটা কোনো ব্যাপারই না, আমি তো স্রেফ সহযোগিতা করেছি— এ আর এমন কী।’ আসল কথা হলো, মুসা পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে তাঁদের হাতে দিয়ে চলে এসেছিলেন গাছের নিচে। না ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন, আর না কোনো বাক্য বিনিময় করেছেন। তিনি এই কাজটি করেছেন শুধুই আল্লাহর জন্য, এর মূল্যায়নও তিনি কেবল আল্লাহর কাছেই চেয়েছেন। মেয়েদের কাছে নয়, আল্লাহর সাথে কথা বলতেই তিনি উদ্গ্রীব। অনেক সময় আমরা একটা ভালো কাজ করি। কিন্তু সাথে সাথে মনের কোণে এর স্বীকৃতি আশা করি অথবা কোনো ছোটোখাটো সুবিধা কামনা করি। এই দুআটি থেকে আমাদের শেখার

আছে যে, কারোর জন্য কিছু করতে হলে আগে কাজটি করার উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে। কাউকে সাহায্য করব, আর সাথে সাথে আল্লাহর থেকে আশা করব, তাঁর কাছেই চাইব; যেন আল্লাহ আমাদের এমনভাবে দেখে রাখেন, যা হয়তো আমরা কল্পনাও করিনি।

স্পষ্টতই, মানুষ অন্য কাউকে এজন্য অনুগ্রহ করে যে, আজকের একটি কাজের বদলে সে মানুষটি আমাকে আগামীকাল অন্য কোনো উপকার করবে। আমি তোমার পিঠ চুলকে দিচ্ছি কারণ, তুমিও আমার পিঠ চুলকে দেবে। কিন্তু এই দু'আয় তার ঠিক উলটোটা ঘটছে। লক্ষ করুন, মুসা আলাইহিস সালাম এখানে গৃহহীন, আইনের চোখে অপরাধী হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরনের কাপড় ছাড়া কাপড় নেই, পথের পাথেয় নেই। এও বোঝা যাচ্ছে, সাথে কোনো খাবার বা পানি না থাকাতেই তিনি জলাশয়ের কাছে থেমেছেন। এমন একটা অবস্থায় যেকোনো মানুষ মরিয়া হয়ে যেত। তবুও মেয়েদের কাজে সাহায্য করার পর তিনি তাদের কাছে কিছু চাইছেন না। চাইছেন কেবল আল্লাহর কাছে। স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন। জানতে চাননি, তাঁকে কোনো বিনিময় দেওয়া হবে কি না।

অবশ্যই সেটা একটা কাজ ছিল। আর কাজ করে আপনি পারিশ্রমিক চাইতেই পারেন। কারও জন্য কাজ করলে সেটা স্বেচ্ছাশ্রম হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার মানে একবার যখন আপনি স্বেচ্ছায় সেবা দেবেন, তখন আপনি এর কোনো বিনিময় চাইবেন না। আর যদি আপনি বিনিময় চান, সেটা শুরুতেই বলুন। স্পষ্ট করে বলুন, ‘আমি এ কাজের জন্য বিনিময় চাই।’ বেশিরভাগ সময় কোনো একটা স্বেচ্ছাসেবী কাজ কিংবা মসজিদের কাজ করে আমরা মনের মধ্যে ভেবে নিই, ‘সারাটা রমজান মাস আমি কাজ করলাম। নিশ্চয়ই সাতাশ রমজানে একটা অনুষ্ঠান করে আমাকে কিছু একটা দেওয়া হবে।’ যদি এই চিন্তা অতি সংগোপনেও করে থাকি, তবে এই দু'আটিকেই আমরা হারিয়ে ফেলছি—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

‘হে আমার রব ! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।’ (২৮ : ২৪)

এখানে এই ‘অনুগ্রহ করেছেন’ বলে অতীতকাল বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইতোমধ্যে আমি যা যা পেয়ে গিয়েছি, আপনার অনুগ্রহ আমার প্রতি সেগুলোই। কী আশ্চর্য! তাঁর ঘর নেই, খাবার নেই, কিছুই নেই, তবু তিনি বলছেন, ‘আল্লাহ, এসবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার এই-ই দরকার ছিল।’ আল্লাহর কাছে আরও চাওয়ার আগে, আল্লাহ তাঁকে যা দিয়ে দিয়েছেন তাতেই তিনি মনযোগী হয়েছেন। অথচ তখন তাঁর কাছে কিছুই ছিল না।

চলুন, মুসা (আ.)-এর দিক থেকে একটু ভাবি। তিনি মরুভূমিতে পানির অভাবে মারা যেতে পারতেন; যাননি। আল্লাহ তাঁকে পানির কাছে নিয়ে এসেছেন, গাছের ছায়ায় বসার জায়গা পেয়েছেন, আল্লাহ যেটাকে বলছেন, ‘অতঃপর সে ছায়ায় গিয়ে বসল।’ সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি আরও ভালো কাজ

করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর কৃতজ্ঞ থাকার জন্য এই কারণটিই যথেষ্ট। নিজের অপ্রাপ্তি নয়; যা আছে সেসব ভেবে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। সোজা ভাষায়, বলছেন, ‘হে আল্লাহ, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। আমি অসহায় ছিলাম, মরেও যেতে পারতাম। হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার মুখাপেক্ষী।’

সুবহানাল্লাহ! কী ব্যতিক্রমি চিন্তা! তিনি শুধু ভাবছেন কী কী ব্যাপারে তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এ দুআর আরও তাৎপর্য আছে। খুব বেশি দিন আগে নয়, মুসা আলাইহিস সালাম এক ব্যক্তিকে ভুলে হত্যা করে ফেলেছেন। অন্য এক ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে একজনকে ঘুষি দেন এবং সে মারা যায়। লোকটি ছিল মিসরের ফারাও-এর খ্রিষ্টান সৈন্য। এরপর তিনি সে স্থান থেকে পালিয়ে এসেছেন। তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া ওই হত্যাকাণ্ডের যথার্থ কারণ থাকা সত্ত্বেও মুসার মনে অপরাধবোধ কাজ করছিল। আল্লাহর কাছে বারবার দুআ করছেন, ক্ষমা চাইছেন, তবুও সে অপরাধবোধ তাঁর মনে রয়ে গেছে। আপনি যখন নিজেকে অপরাধী ভাবেন, তখন কী করা উচিত আপনার? এখান থেকে এটা আমাদের শেখার আছে। জীবনের চলার পথে আমরা অনেক ভুল করি। এমন অনেক কিছু করি, যা আল্লাহ আমাদের থেকে আশা করেন না। এরকমটা হয়ে গেলে কী করেন? হতে পারে, সে ভুল একেবারে ক্ষুদ্র, কিংবা অনেক বড়ো। মুসা আলাইহিস সালামের ভুলটি কিন্তু ছোটোখাটো ভুল নয়। আপনি-আমি এ ধরনের একটি কাজ করলে বাকি জীবন হয়তো আর ঘুমাতেই পারতাম না। বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হতে থাকতাম। কিছুতেই ভুলে যেতে পারতাম না।

মনে করুন, আপনি কাউকে নিয়ে কোনো খারাপ কথা বলেছেন অথবা রাগের মাথায় কারও দুর্নাম করেছেন। এগুলোও ভুল। কিন্তু আপনি সহজেই এগুলো ভুলে যান। দুবছর আগে করা এমন একটা কাজ আপনার মনেই থাকবে না হয়তো। কিন্তু কাউকে মেরে ফেলা? এটা জটিল ব্যাপার। আমাদের সবার অতীত ভুল আছে। কিন্তু কিছু ভুল এমনভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যা জীবনকে থমকে দেয়। মনের মধ্যে শুধু সে ভুলটিই ঘুরপাক খেতে থাকে। এই দুআটি আমাদের শেখাচ্ছে, যদি তুমি অতীতে কোনো ভুল করেও থাকো, যদি খুব খারাপ কিছু করে থাকো, সেইসব আল্লাহ ঢেকে দেবেন। আমি নিশ্চিত, আপনার সে ভুল মুসা আলাইহিস সালামের করে ফেলা ভুলের মতো নয়, আপনার পেছনে পুলিশ নেই, আপনি ফেরারি নন। কিন্তু আল্লাহ এই চরম উদাহরণ দিয়েছেন এজন্যই। আমরা যেন ভাবতে পারি, যদি সেই ভুলকেও আল্লাহ ঢেকে দেন, আমিও ক্ষমা পাব, আমিও খুব খারাপ হয়ে যাইনি।

তাহলে এখানে শিক্ষাটা কোথায়? আপনি যদি কোনো ভুল করেই ফেলেন, তাহলে আপনাকে মরিয়া হয়ে সুযোগ খুঁজতে হবে, কতভাবে আপনি মানুষের সেবা করতে পারেন। মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ক্ষুৎপিপাসায় মৃতপ্রায়। তিনি দেখলেন, দুইজন সাহায্য প্রত্যাশীকে। তারা সাহায্য চায়নি; বরং তিনি এ সুযোগ নিজেই খুঁজে নিয়েছেন। ভাবেননি, আমি বিশ্রাম নিয়ে নিই, পরে দেখা যাবে কী করা যায়। তিনি বুদ্ধিমান, পরিস্থিতি বুঝেছেন, তবু সমস্যা আপনা থেকে

সমাধানের অপেক্ষায় থাকেননি। তিনি সাহায্য করতে মরিয়া। আপনার করা যদি কোনো ভুল থাকে, আপনার উচিত সে ভুলটি যেন আপনার মধ্যে একটি জ্বলন্ত স্পৃহা হয়ে ওঠে, যা আপনাকে ভালো কাজের জন্য উদ্দীপনা দেবে। যখনই আপনার সামনে একটি সুযোগ আসবে, আপনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, উদ্দীপনাহীন, যা-ই হোন না কেন, আপনার নিজেকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। সেই উদ্দীপনা আসবে আপনারই করা ভুলগুলো থেকে।

তাহলে দু'আটির আরও একটি অর্থ আমরা বুঝে নিলাম। ‘হে আল্লাহ, আমি অতীতে একটি বড়ো ভুল করেছি। এর প্রতিদানে কিছু করার যে সুযোগই আপনি আমাকে দিন, আমি লুফে নেব। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ প্রভু। এই অসহায় মহিলাদের সাহায্য করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’ এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করুন। আপনি যখন কাউকে সাহায্য করবেন, আদতে আপনি তাদেরকে দয়া, করুণা করছেন না; বরং তারাই আপনাকে দয়া ও করুণা করছে। কীভাবে? আমাদের দ্বীনে আপনি যখন কাউকে কিছু দান করেন, হতে পারে সে আপনার দরজায় ভিক্ষা করছে এমন কেউ, আপনি আসলে তাদেরকে সাহায্য করছেন না। তারা আপনাকে সাহায্য করছে। তারা শেষ বিচারের দিনে আপনার জন্য সাক্ষী হয়ে গেল। তারা আপনার অপরাধগুলোর ক্ষমা হয়ে গেল। আপনি তাদেরকে এ অস্থায়ী দুনিয়ায় সাহায্য করেছেন, যা আসলে আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তারা আপনাকে আখিরাতের জন্য সাহায্য করবে, আল্লাহর কাছে সেটাই সবচেয়ে দামি। এটাই হলো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

এ দু'আর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। মুসা আলাইহিস সালাম এই দু'আয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁকে যা যা দেওয়া হয়েছে সেসবের জন্য। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের যে কারও চেয়ে তিনি ছিলেন নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। বিরান মরুভূমিতে তিনি অসহায় অবস্থায় উপনীত হয়েছেন, তাঁর খাবার প্রয়োজন, আশ্রয় প্রয়োজন, সুরক্ষা প্রয়োজন, জীবিকা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি সেসবের জন্য আল্লাহর কাছে চাইছেন না। আমাদের তো আল্লাহকেই সব প্রয়োজন বলা উচিত, তিনি কেন বলছেন না? তিনি বলতে পারতেন, আল্লাহ আমাকে বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ আমাকে আশ্রয় দিন, আমার জীবনমরণ সমস্যা, আপনি ঠিক করে দিন। কেন তিনি এসবের কিছুই চাইছেন না? বরং বলল ‘যা আমাকে দিয়েছেন, আমি সেসবেরই মুখাপেক্ষী’ এর আড়ালে সূক্ষ্মভাবে আসলে কী বলতে চাচ্ছেন তিনি?

আমি একটা উদাহরণের সাহায্য নিচ্ছি কারণ, এটি আমাদের ধর্মের একটি মৌলিক ধারণা। আমাদের বাচ্চারা মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে খুব নাক সিঁটকায়। আপনি তাকে সবজি খেতে দিয়ে বললেন, ‘গাজরটা খেয়ে ফেলো।’ সে জবাব দেয়, ‘না আমি গাজর খেতে চাই না, আমি চকলেট খাব।’ সে পানির বদলে জুস চায়, খাবার শেষ করার আগেই আইসক্রিম চায়। আপনার কি তখন রাগ হয়? কিছুটা হওয়ার কথা। ‘আমি যা খেতে দিচ্ছি, তাতে তুমি খুশি হচ্ছ না কেন? এটাই তোমার শরীরের জন্য প্রয়োজন। তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে, ওষুধ খেয়ে নাও। রাতে এই খাবারটা খাওয়া তোমার জন্য দরকারি, খেয়ে ফেলো’ ইত্যাদি বলতে থাকেন। কিন্তু আপনার বাচ্চা সেসব

চাইতেই থাকবে, যদিও সেসব তার জন্য ভালো না। তার সামনে আপনি যা দিয়েছেন, সেটাকে সে পান্নাই দেবে না।

একজন বিশ্বাসী মানুষ অনুভব করতে পারে, তাঁর আল্লাহ যা যা দেন, তার টেবিলে যে খাদ্যসম্ভার, তার জীবিকা, তার ব্যবসা, যা-ই হোক না কেন, এসব কেবল ‘ভালো’ ব্যাপার নয়; বরং তাঁর ঠিক এসবেরই দরকার ছিল। আপনি আল্লাহর সাথে ওরকম বোঝাপড়া করেন না। বলেন না, ‘ইয়া আল্লাহ, আমি জানি না আমার এই জিনিসটি চাই কি না।’ আপনি অনুযোগ করেন না, ‘আল্লাহ, আমি জানি আপনি আমাকে বসার জন্য এই পাথরটা বা এই গাছের ছায়া দিয়েছেন, কিন্তু এর বদলে আমাকে একটা সোফা দিলে আরও ভালো হতো। আপনি আমাকে পান করার জন্য পানি দিয়েছেন, কিন্তু একটু ডাবের পানি হলে বেশ হতো।’ এমন করে কি বলেন? অবশ্যই না। বরং আল্লাহ যা দেন, সেটাই আসলে সবচেয়ে দরকারি জিনিস, যার খোঁজ আপনি করছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম এখানে নিজের জন্য কী শব্দ ব্যবহার করেছেন? ‘ফকির।’ ফকির আর মিসকিন এই দুয়ের পার্থক্য কী? মিসকিন হলো তারা, যারা অসহায়। আল্লাহ বলছেন—

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ-

‘সাদকাহ হলো দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য।’ (৯ : ৬০)

আল্লাহ দুটি শব্দকে একসঙ্গে রেখেছেন। সাদকাহ বা দান করতে হবে ফকির এবং মিসকিনদের। দুটো শব্দ একসঙ্গে রাখার অর্থ হচ্ছে, এদের অর্থ আলাদা। ইবনে মানজুর তাঁর *লিসান আল আরাব* গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ফকির হলো এমন অবস্থা, যার থেকে খারাপ আর হতে পারে না। মিসকিনের কিছু না কিছু থাকে।’ সূরা কাহাফে আল্লাহ বলছেন—

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ-

‘নৌকাটি ছিল কিছু মিসকিনের, যারা নদীতে কাজ করত।’ (১৮ : ৭৯)

তার মানে যে মিসকিন, তার কিছু না কিছু থাকতে পারে। হয়তো একটা নৌকা থাকতে পারে, সে জেলে হতে পারে, তার একটা জীবিকাও থাকতে পারে। কিন্তু ফকির? তার কিছুই নেই, একেবারেই কিছু না। মুসা আল্লাহকে বলছেন, ‘আমার কিছুই নেই।’ আরবিতে একটা কথা আছে— ‘পথচারী লোকের কোনো যানবাহনেই আপত্তি হয় না (বাংলায় প্রবাদটি ঠিক এরকম—ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া)।’ এর অর্থ কি জানেন? মরুভূমির মধ্যে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন কাউকে যদি একটা গাধা, কিংবা একটা ঘোড়া এমনকী একটা কচ্ছপও দেওয়া হয়, সে গ্রহণ করবে। আপত্তি করবে না যে, ‘আহা আরেকটু আরামের কিছু যদি পেতাম! আমি এইটায় উঠব না।’ যেহেতু সে নিরুপায়, যা পাবে তা-ই হাত পেতে নেবে। মুসা আলাইহিস সালাম এমনভাবেই আল্লাহর কাছে চাইছেন, ‘আল্লাহ, আমি জানি আমার কিছু নেই। আমার উপার্জনেরও উপায় নেই। আপনিই আমাকে এসব দিয়েছেন, যা আমার আছে। আমার কোনো অভিযোগ নেই।’

যে কথাটি বলতে চাই, তা এর মধ্যেই আছে। যখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, নিজেকে ফকির বলেছেন। ফকির মানে হলো, যার পিঠ ভেঙে গেছে। যে মানুষের পিঠ ভেঙে যায়, সে কিছু উঠাতে পারে না, নিজে থেকে কিছু নিতে পারে না যতক্ষণ না কেউ এগিয়ে দেয়। তিনি এজন্যই বলেছেন, ‘ইয়া আল্লাহ, আমি ফকির, তাই আপনি আমাকে যা কিছু দেওয়ার দিয়েছেন, আমি নিজে সেসব অর্জন করিনি।’ সুবহানাল্লাহ, এই ছিল মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বীকৃতি।

এই দুআর পরে আয়াতে সূরা ক্বাসাসে কী বলা হয়েছে দেখুন—

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا-

‘সুতরাং (কিছুক্ষণের মধ্যে) রমণীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর নিকট এলো ও বলল, “আমার পিতা (হজরত শোয়াইব) আপনাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। কেননা, আপনি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়েছেন।” অতঃপর মুসা (আ.) তাঁর (হজরত শোয়াইবের) নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, “ভয় কোরো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে রক্ষা পেয়েছ।” (২৮ : ২৫)

পরের বাক্যটি খুব ভালো করে খেয়াল করুন। ‘সুতরাং (কিছুক্ষণের মধ্যে) রমণীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর নিকট এলো ও বলল, “আমার পিতা আপনাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন।”’ এখানে ‘সুতরাং’ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। মুসা আলাইহিস সালাম কি টাকা-পয়সা চেয়েছিলেন? না। তিনি কি চাকরি চেয়েছিলেন? না। তিনি কি মেয়েদের বাসায় দাওয়াত চেয়েছিলেন? না। এর কোনোটাই চাননি। তিনি কেবল আল্লাহর দিকেই মন ফিরিয়েছিলেন, আর বলছিলেন, ‘আপনি যা-ই আমাকে দিয়েছেন, আমার এরই দরকার ছিল। আমি এরই কৃতজ্ঞতা পেশ করছি।’ এটা একটা সূত্রের মতো।

আপনি আল্লাহর দিকে কৃতজ্ঞতাভরে ঘুরে তাকান, এখানে আল্লাহর নিয়ম কাজ করবে। আমরা প্রকৃতির নিয়ম দেখেছি, কিন্তু কুরআনের সূত্র বা নিয়মগুলো আরও শক্তিশালী। প্রকৃতির নিয়ম বদলাতে পারে। আগুন পোড়ায়, কিন্তু সে আগুন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পোড়ায়নি। পানি তার পাত্রের আকার ধারণ করে, কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের লাঠির আঘাতে আল্লাহ পানিকে তার ধর্ম থেকে অন্য কিছু করিয়েছেন। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মকে আল্লাহ চাইলে বদলে দেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁর কুরআনে যে নিয়ম দিয়েছেন, তা খণ্ডন না। দুআর ব্যাপারেও সেই একই সূত্র। কী সেই সূত্র? যখন আপনি আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন, আল্লাহই আপনার দায়িত্ব নেবেন।

কী ঘটল এরপর? মেয়েটি ফেরত আসলেন এবং বললেন, ‘আমার বাবা আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে চান।’ তিনি মেয়েটিকে কী বললেন? ‘না বোন, আমি যা করেছি, আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি। আমি এর জন্য কোনো টাকা চাই না।’ তিনি বলেছিলেন এসব? না; বরং তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন, এই হলো তাঁর দুআর জবাব। তিনি অযথা লজ্জা করেননি, অহেতুক ফিরিয়ে

দেননি। বলেননি, ‘না না ধন্যবাদ, এসবের কী দরকার ছিল?’ যখন কেউ আপনাকে সাহায্য করতে চাইছে, হতে পারে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। হতে পারে সেটা আপনার দুআর জবাব। সুতরাং কেউ আপনাকে একটা চাকরি দিতে চাইছে, আর আপনি বলছেন, ‘না না, এই অনুগ্রহ আমার চাই না।’ আল্লাহর অনুগ্রহ আপনি কেন ফিরিয়ে দেবেন? মুসা আলাইহিস সালামের আত্মসম্মানবোধ আপনার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তিনিও লজ্জা পেয়ে সরে যাননি। বলেননি, ‘না না, আমি স্বেচ্ছায় কাজ করেছি, আমি এর বিনিময় চাই না।’ হ্যাঁ, তিনি মানুষের কাছে আশা করেননি। কার কাছে আশা করেছেন? আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়া কোনো মানুষকে ফেরান না।

আসুন একটু ভাবি, কী ঘটেছিল। মুসা আলাইহিস সালাম একাত্ততর সঙ্গে যে দুআ করেছেন, তার জবাব দেখুন। তাঁকে কেবল মেয়েদের ঘরে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি, সেদিনের আলাপচারিতার মাঝেই মেয়েদের পিতা তাঁকে প্রস্তাব দেন, তাঁর একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। তিনি সে প্রস্তাব মেনে নেন, বিয়ে করেন। পরবর্তী আট বছরের জন্য একটি চাকরিরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। সুতরাং তিনি থাকার জায়গা পেয়ে যান, জীবিকার ব্যবস্থা হয়, বিয়ে করেন, প্রবাসী অবস্থার অবসান হয়। এত সব হয় এক পলকে, কেবল একটি দুআয়। তিনি এসবের কিছুই চাননি। আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের জন্য একটা নতুন পরিবার, একটা নতুন জীবনের সূচনা লিখে দিয়েছিলেন। মরুভূমির মাঝে, একদম শূন্য থেকে। শুধুই এজন্য যে, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের মূল্যায়ন করেছিলেন।

আমাদের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া উচিত, শোকর আদায়কারী মানুষ হওয়া উচিত। ঠিক যে কারণে আপনি মুসা আলাইহিস সালামের প্রশংসা করবেন। কেন প্রশংসা করবেন? প্রশংসা করবেন তাঁর সেই সময়ের আচরণ দেখে, যখন তাঁকে আবারও মরুভূমিতে নামতে হয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম দুইবার মরুভূমিতে নেমেছিলেন। একবার একা, নিজ দেশের আইনের হাত থেকে বাঁচতে। দ্বিতীয়বার নিজের পুরো জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেছেন, ফেরাউনের কবল থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য। যখন এই দ্বিতীয়বারের যাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন—

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ-

‘আর স্মরণ করো, তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো, তাহলে আমি তোমাদের আরও বেশি দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি বড়োই কঠিন।’ (১৪ : ৭)

তাঁর সামনে ইসরায়েলিরা মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পানি আর খাবারের অভাবে অভিযোগ পেশ করছে। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘তোমাদের রব এই ঘোষণা দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ হও,

তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও দেবেন।’ মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে শুধু একটা তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন না; বরং তিনি নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাদেরকে শেখাচ্ছেন। তিনি এটি আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন, অফুরন্ত দিয়েছেন। বনি ইসরাইলকে শেখাতে গিয়ে তিনি এই যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটিই আল কুরআনে গ্রন্থিত হয়েছে।

সুতরাং আমরাও এটা শিখলাম। আমরা খুব দ্রুত ভুলে যাই। আমাদের যা আছে সেসবের দিকে তাকাতে এবং যা নেই সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না রাখতে ভুলে যাই। আমাদের যা আছে, যেটুকুর জন্যই আমরা বেঁচে আছি, যেটুকুর জন্য আমরা ফকির-এর স্বীকৃতি দিতেও আমরা ভুলে থাকি। আমরা যখন এ স্বীকৃতির দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলব, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া এবং এর মধ্যের সকল কিছু দান করবেন, কোনো বাধা থাকবে না।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

‘যারা এ পৃথিবীতে সদাচারণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়ো। ধৈর্যশীলদেরকে তো অটেল পুরস্কার দেওয়া হবে।’ (৩৯ : ১০)

ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত বিনিময় দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এই সুন্দর দুআকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করুন।

দুআ ও হতাশা

এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, তা প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। সেটি হচ্ছে ‘দুআ’। যুবক থেকে বৃদ্ধ— ভিন্ন ভিন্ন বয়সের নানান মানুষের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘আমি কোনো বিশেষ একটা জিনিস খুব করে পেতে চাইছি এবং সেটা পাওয়ার জন্য খুব করে দুআ করছি।’ হয়তো একজন যুবক ছেলে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে অথবা সে কোনো একটা বিশেষ চাকরি খুঁজছে অথবা সে তার ইমিগ্রেশন পেপারগুলো পাশ করাতে চাইছে। যারা বয়সে আরেকটু বয়স্ক, তারা হয়তো তাদের সন্তানের জন্য দুআ করছে; যেন তাদেরকে সঠিকভাবে গাইড করতে পারে। তাদের সন্তানরা হয়তো অবাধ্য, নামাজ পড়ছে না, তাদের মা-বাবার কথা শুনছে না। তাদের মায়েরা এসে কেঁদে বলছে, ‘আমি আমার ছেলের জন্য অনেক অনেক দুআ করছি, এমনকী আমি বছরের পর বছর ধরে একই দুআ করে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সবকিছু ভালোর বদলে উলটো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কী করতে পারি? কেন আমার দুআ কবুল হচ্ছে না?’

কিছু মানুষ এমন আছে যারা এসে বলছে, ‘আমি অসুস্থ এবং দিনকে দিন আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। এমনকী আমি উমরাহ করেছি, আমি হজে গিয়েছি, মসজিদুল হারামে গিয়ে দুআ করেছি। আমি মসজিদ-আল-নববিতে গিয়েছি এবং মধ্যরাতে দুআ করেছি এবং সারারাত ইবাদত করেছি, কিন্তু তবুও আমার দুআ কবুল হচ্ছে না! আমার কী করা উচিত? আমি আর কিই-বা করতে পারি?’

আবার কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলে, ‘আমি সবসময় দুআ করি, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।’ চমৎকার এক যুবকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল, ‘ভাই, আমি খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগি করি না। কিন্তু আমার সামনে একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল, যার জন্য আমি ভাবলাম,

প্রচুর দুআ করব এবং প্রয়োজনে নামাজও পড়ব। আমি পুরো দশ মিনিট দুআ করার পরও ফেল করেছি! তাই এখন আর আমি নামাজও পড়ি না। কারণ, আমি যা চেয়েছি তা পাইনি।’

এসব ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করে আমার যেটা মনে হলো, দুআ বলতে আসলে কী বোঝায়, সেটা নিয়ে অনেকের মাঝেই অনেক ভুল ধারণা আছে, আছে সংশয়। আমরা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইছি বলতে আসলে কী বোঝায়? আমরা আসলে কোন অবস্থান থেকে কী চাইছি? আমরা কি আল্লাহর কাছে ঠিক সেরকমই চাইছি, যেরকম আমাদের মা-বাবা বা অন্যরা চাইছে? ঠিক সেরকম নাহলেও আসলে কীরকম? আমরা যখন আল্লাহর কাছে দুআ করি, তখন আমাদের কী প্রত্যাশা করার কথা ছিল?

এই ক্ষুদ্র কিন্তু মৌলিক বিষয়টির ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম মানসে ভুল ধারণা এবং দ্বিধা-সংশয় আছে। প্রকৃত অর্থে আমাদের ধর্মের মূল কেন্দ্রে আছে এই ‘দুআ’। সূরা ফাতিহা, যেটাকে বলা হয় কুরআনের ভূমিকা এবং একইসঙ্গে এটি কুরআনের আত্মা হিসেবে খ্যাত। এই সূরা ফাতিহার আরেক নাম হচ্ছে ‘দুআ’।

যে সকল নবির কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই দুআর ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিলেন। আমরা হয়তো সবকিছুর বিস্তারিত জানি না, কিন্তু এটাই ছিল তাদের প্রত্যেকের অন্যতম মূলমন্ত্র। নুহ (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। আমরা এই ৯৫০ বছরের সকল খুঁটিনাটি জানি না। কিন্তু আমরা জানি তাঁর দুআ সম্পর্কে; যা আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কেও খুব বেশি কিছু জানি না। কিন্তু অল্প যতটুকু জানি তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর দুআ। যে একটি বিষয়ে আল্লাহ সকল নবি-রাসূল সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, ওনারা কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, কীভাবে কোনো কিছু চাইতেন। তাই ইসলামে ‘দুআ’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

নবি চরিত্রের একটি বড়ো ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘দুআ’। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছুই করি না কেন, তাঁর প্রত্যেকটিই একেকটি ইবাদত, উপাসনা। আমাদের ঘরে-বাইরে আসা-যাওয়া থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক পরিবর্তন, একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান সবই এক একটি ইবাদত। এটা সত্যিই অসাধারণ যে, আমাদের জীবনে এমন কোনো ঘটনাই নেই, যা নবিদের জীবনের সাথে কোনো না কোনোভাবে মেলে না। তাই এই ‘দুআ’ ব্যাপারটি আমাদের দ্বীনের অন্যতম মূল ফোকাস এবং এটি নিয়ে কোনো প্রকার সংশয় থাকা সত্যিই উচিত নয়।

যদিও এই ক্ষুদ্র পরিসরে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়; তবুও আমি কুরআনের অল্প কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়টির মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট তুলে ধরার চেষ্টা করব।

প্রথম যে দুটি আয়াত নিয়ে আমি কথা বলতে চাই তা হচ্ছে, সূরা মারইয়াম-এর দুটি আয়াত।

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا-

‘সে বলল- “হে আমার পালনকর্তা, আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক শুষ্ক হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা, আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।”’ (১৯ : ০৪)

হজরত জাকারিয়া (আ.), যিনি কিনা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলেন, এই আয়াতের শুরুতেই বলছেন- ‘إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي’ উনি সত্যি এ কথাই বলছেন যে- ‘আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে’ এখানে ‘মিন’ অর্থ হলো মিন-আল-তাবিদ। আপনি জানেন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, যখন অস্থি এবং তার জোড়াসমূহ ঠিক স্বাভাবিকভাবে যতটুকু শক্তিশালী ছিল, পরবর্তী সময়ে যদি ততটুকু শক্তিশালী না থাকে, তখন মানুষ অস্থিসন্ধিসমূহে বাত বা অন্যান্য বার্ধক্যজনিত ব্যাথায় আক্রান্ত হয়। উনি আসলে ঠিক সে বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। এটা ছিল তাঁর বয়সের ঠিক সেই সময়, যখন তাঁর নামাজের রুকুতে যেতেও কিছুটা সময় লাগত। সেই সময় তাঁর জন্য হঠাৎ করে বসে পড়াও সহজ ছিল না।

আপনারা যারা যুবক, তারা চাইলেই যখন তখন কোনো সমস্যা ছাড়াই ধূপধাপ করে উঠবস করতে পারেন। কিন্তু যখন আপনাদের হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়বে যেমন, কোনো বয়স্ক পুরুষ বা নারীকে বসতে দেখবেন, দেখবেন তারা খুব আস্তে একটু সময় নিয়ে বসছে। তারা চাইলেই ধূপ করে বসে পড়তে পারে না। তাদেরকে বিছানা থেকে উঠতেও কিছুটা সময় লাগে। তারা চাইলেই যুবক ছেলে বা মেয়ের মতো লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। কিছু যুবক ছেলেমেয়ে আছে, যারা ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে পড়ে যায় এবং তারপর আবার উঠে পড়ে এবং এতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু একই কাহিনি যখন কোনো বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে ঘটে, যাদের হাড়গুলো ইতোমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন তার ফলাফল খুব একটা ভালো হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ER (বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা) পর্যন্ত গড়ায়। এটা আসলেই খুব মারাত্মক।

সুতরাং আল্লাহর সাথে ওই কথোপকথনের শুরুতে তিনি তাঁর শরীরের হাড়ের দুর্বলতার কথাই বোঝাচ্ছিলেন। তারপর নিজের মাথার চুলের দিকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন- ‘আমার চুলগুলোও আগুনে পোড়া ছাইয়ের মতো ধূসর হয়ে পড়েছে।’ মাথার চুল সাধারণত কালো হওয়ার কথা। কিন্তু কোনো কিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর তা যেমন সাদা ও ধূসর বর্ণ ধারণ করে তাঁর চুলগুলোও সে রঙে পৌঁছে গিয়েছিল। আরবিতে একটা কথা আছে যে, شيبك نألك অর্থাৎ আপনার চুল ধূসর বা সাদা

হয়ে যাওয়ার অর্থ আপনার মৃত্যু খুব সন্নিকটে। অন্যভাবে বলতে গেলে— আপনি যতবার আপনার এই ধূসর চুলের দিকে তাকাবেন, আপনি একধাপ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন।

তাই তিনি তাঁর দুআ শুরু করেছিলেন নিজের অক্ষমতার কথা বলে যে, উনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাতে বোঝা যায়, তিনি বুঝতে পারছিলেন যে মৃত্যু তাঁর খুব সন্নিকটে। আমি এটা বলতে চাই না যে উনি কী দুআ করেছিলেন। বরং দুআ করার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তুলে ধরতে চাই। তিনি বলছিলেন— ‘হে আমার রব, আমি তো কখনোই আপনাকে ডেকে হতাশ হইনি, মনঃস্কুণ্ণ হইনি বা আমার মন খারাপ হয়নি। আমি যখন আপনাকে ডেকেছি, তখনই প্রশান্তি পেয়েছি। আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি।’ তিনি নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে আল্লাহর নিকট এ কথাগুলোই বলছিলেন।

এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, একজন বয়োবৃদ্ধ লোক যার কোনো সন্তান নেই, যে কিনা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন, যার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যুর পরে তাঁর নাম নেওয়ার মতো একটি লোক অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, একটি সন্তানের জন্য তিনি এই প্রথমবারের মতো দুআ করছেন না। উনি ওনার পুরো জীবন জুড়েই দুআ করে আসছেন এবং বলছেন— ‘আমি আপনাকে ডেকে কখনো নিরাশ হইনি।’ ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন? কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন— ‘আমি আপনাকে ডেকে কখনো নিরাশ হইনি।’ সুবহানাল্লাহ!

আপনি যদি আরবি অভিধানে এই ‘শিকুওয়াহ’ শব্দের অর্থের দিকে খেয়াল করেন, তবে দেখবেন এই শব্দটি সবসময় সুখ বা প্রশান্তির বিপরীত অর্থ বহন করে। এর অর্থ বিষাদ, দুঃখভার এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিষণ্ণতা। এটা কখনো ক্ষণস্থায়ী মন খারাপ বোঝায়, আবার কখনো দীর্ঘস্থায়ী। আরবিতে এটাকে তারা বলে ‘ইউমাদ ওয়া-ইউকসার’। আপনার পরিবারের মধ্যেই দেখবেন, কিছু লোক আছে যারা প্রায় সারাক্ষণই বাজে মেজাজে থাকে, আবার কেউ কেউ এই ভালো তো এই মন্দ। উভয় ক্ষেত্রেই এই ‘শিকুওয়াহ’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

আমরা আল্লাহর কাছে কীভাবে দুআ করব? এখানে হজরত জাকারিয়া (আ.) যে পদ্ধতিতে দুআ করছিলেন, তাতে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আমরা কার কাছে কোনো কিছু চাইছি? আমরা আমাদের রবের নিকট চাইছি।

আমরা সাধারণত তখনই আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাই, যখন মনে করি এই জিনিসটি আমার এখন প্রয়োজন। ঠিক? আপনি শুধু যখন খুব বিপদে পড়ে যান, ঠিক তখন সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকেন। আপনার কোনো সন্তান অসুস্থ হলে বা তাকে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন পড়লে তার সুস্থতা কামনা করে দুআ করেন। আপনার কোনো চাকরির ইন্টারভিউ থাকলে তখন সফলতা চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। আপনি আপনার বাড়ি করার চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন, তখন দুআ করে বলেন— ‘ইয়া আল্লাহ, এটা অনেক বড়ো একটা চুক্তি; এখানে

আমি অনেক বড়ো অঙ্কের একটা টাকা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছি, আপনি একটু দেখুন।’ অর্থাৎ আপনি ঠিক তখন দুআ করেন, যখন আপনার জীবনে কোনো সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনার এই সমস্যা থেকে উত্তরণ প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই, আমি-আপনি প্রতিদিন যখন ঘুম থেকে জেগে উঠি তখন দেখুন, আমাদের ফুসফুসকে সারা রাত সচল রাখার জন্য একটি করে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের প্রয়োজন পড়েনি। প্রতিরাতে আমরা যখন ঘুমাতে যাই তখনো আমাদের হৃদপিণ্ড চলতে থাকে। প্রত্যেক সকালে ঘুম ভেঙে আমরা আমাদের চোখ খুললেই দেখতে পাই, আমাদের কানগুলোও শুনতে পায়, অথচ এরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এরা কোনো রিচার্জবল ব্যাটারিচালিতও নয়। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া এদের কারও চলার ক্ষমতা নেই। আমাদের পরবর্তী নিশ্বাস, পরবর্তী হৃদস্পন্দন, বেঁচে থাকার জন্য আরও একটি দিন— সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অব্যাহতভাবে দিয়ে যাচ্ছেন।

এত কিছু সত্ত্বেও আমরা কেবল তখন আল্লাহর কাছে ফিরে আসি, যখন আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় বা আমরা কোনো কিছুর অভাববোধ করতে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে ক্রমাগত দিয়েই যাচ্ছেন, এমনকী আমাদের কোনো চাওয়া ছাড়াই। আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ চাইতে হয় না। আপনি কি ভাবতে পারেন, সেটা করতে হলে কেমন হতো? একইভাবে আমাদের প্রতিমুহূর্তের শ্রবণশক্তি, আমাদের চোখের দৃষ্টি, আমাদের কথা বলার ক্ষমতা— কোনো কিছুর জন্যই আমরা প্রতিনিয়ত দুআ করি না। একবার চিন্তা করে দেখুন, যদি এমন হতো, প্রতিবার কথা বলার আগে আমাকে আল্লাহর কাছে কথা বলার শক্তি চেয়ে দুআ করতে হচ্ছে এবং অতঃপর তিনি অনুমতি দিলে তবেই কেবল আমি কথা বলতে পারছি! কেমন হতো তখন? সুবহানআল্লাহ!

এমন অসংখ্য জিনিস আল্লাহ আমাদের প্রতিনিয়ত দিয়েই যাচ্ছেন আর দিয়েই যাচ্ছেন, যেগুলো আমাদের টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যিক। আমি বা আপনি প্রায়শই ভাবি, আল্লাহ আমাকে এটা দেননি অথবা কেন আল্লাহ আমাকে এটা দিলেন না, কেন তিনি আমার এই দুআ কবুল করলেন না? কুরআনুল কারিমের একটা আয়াত আমাদের মনে রাখা দরকার— ‘তিনি প্রতিনিয়তই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছেন।’ (৫৫ : ২৯)

তিনি সদা-সর্বদা আমাকে-আপনাকে আরও আরও বেশি দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। তাই কেউ যখন তার দুআ নিয়ে হতাশা, দুঃখ কিংবা মন খারাপে ভোগে, তখন সে হয়তো বুঝতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য প্রতিনিয়ত কী কী করে যাচ্ছেন।

আমি ব্যাপারটা আপনাকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

আপনার মা আপনাকে ভালোবাসেন। আমি সেসব ভাগ্যবানদের কথা বলছি, যাদের মা এখনও জীবিত আছেন এবং আপনাদের সাথে একই দেশে বসবাস করেন অথবা আপনি তাঁর সাথে দেখা

করতে যেতে পারেন। আপনি হয়তো অনেকদিন পর আপনার মায়ের সাথে দেখা করতে যান। তিনি এখন ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি আপনার জন্য খাবার তৈরি করেন, টেবিলে পরিবেশন করেন এবং আপনাকে স্বস্তি জড়িয়ে ধরে খেতে বসান। আপনি যদি তখন খেতে বসে বলতে শুরু করেন, ‘মা, লবন কোথায়? ওহ মা! তুমি জানো না আমার খাবারের সময় বাড়তি লবন লাগে? তুমি তো আমাকে সালাদ দাওনি? আমি ভাবলাম তুমি আমার জন্য পেপসিও আনবে, শুধু সেভেনআপ কিনেছ?’

আপনি কেমন অকৃতজ্ঞ সন্তান, যে মা আপনার জন্য এতকিছু করার পরও তিনি শুধু আপনার জন্য কী কী করেননি, সেটা ভেবেই হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। উনি আপনার জন্য কী কী করেননি, আপনি শুধু তাই ভাবছেন। এতে বোঝা যায় আপনার মা আপনার জন্য কী কী করেন, আপনাকে কতটা ভালোবাসেন এবং যত্ন নেন— সে ব্যাপারে আপনার কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

এটা হচ্ছে আপনি এবং আপনার মায়ের মধ্যকার চিত্র। আর আমরা কথা বলছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ব্যাপারে। আমরা এমন একজনের ব্যাপারে কথা বলছি, যার ভালোবাসা শুধু যে পরিমাপই করা যায় না তা নয়; বরং তা কখনো গুনেও শেষ করা অসম্ভব। মানুষ প্রায় বলে, ‘কীভাবে আল্লাহ আমার এই দুআটা না শুনে পারলেন?’ এটা খুবই আপত্তিকর একটা প্রশ্ন। আল্লাহর ব্যাপারে এমন প্রশ্ন উত্থাপন সত্যিই আপত্তিকর। আপনি এ কথা কীভাবে বলতে পারেন যে, ‘আল্লাহ শোনেন না?’ যা দিয়ে রেখেছেন, অব্যাহতভাবে দিয়ে চলছেন—তা একবার হিসেব করে দেখেছেন?

আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা শুধু এটাই বলেননি যে তিনি সব শোনেন; বরং তিনি আপনার সব দুআর উত্তরও দেন। তাহলে প্রশ্ন আসে, কেন তিনি সেভাবে আমাদের দুআর উত্তর দেন না, ঠিক যেভাবে আপনি বা আমি চাই? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, আদতে কোনটা দুআ আর কোনটা দুআ নয়— সেটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি কি না। দুআ কোনো রেস্টুরেন্ট-এ খাবার অর্ডার করার মতো বিষয় নয়। রেস্টুরেন্ট-এ কোনো অর্ডার করলে এটা আশা করতেই পারেন যে, যেহেতু টাকা দিচ্ছেন তাই আপনি যা চাচ্ছেন, তা-ই পাবেন। আপনি ফ্রেন্ডস ফ্রাই অর্ডার করলে ফ্রেন্ডস ফ্রাই-ই পাবেন। কেউ আপনাকে বার্গার দিতে আসবে না। আপনি একটি ল্যাপটপ অর্ডার করলে কেউ আপনাকে একটি মোবাইল ফোন প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেবে না। আপনি যা অর্ডার করেন, তা-ই পান এবং অবশ্যই আপনি তার জন্য বিল পরিশোধ করেন। টাকার বিনিময়ে আপনি আপনার অর্ডার করা পণ্যসেবা পেয়ে থাকেন।

কিন্তু যখন আমি-আপনি যে দুআ করি, তার জন্য কোনো টাকা দিই না, কোনো বিল পরিশোধ করি না। আর আপনি যেহেতু টাকা দিচ্ছেন না, তাই এ ব্যাপারে আপনার অভিযোগ করারও কোনো অধিকার নেই। আপনি অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন না যে, আপনি যা যখন যেভাবে চাচ্ছেন তা তখন সেভাবেই পেয়ে যাবেন। আপনি এটা বলতে পারেন না যে, ‘এই যে হ্যালো, আমি পরীক্ষায় একশো নম্বর চেয়েছিলাম এবং গতরাতে এজন্য দুআও করেছি, কিন্তু আমি পেয়েছি মাত্র চল্লিশ! এটা কী হলো প্রভু? আমি তো এমনটা চাইনি!’ আমি-আপনি এভাবে নেগোশিয়েট করতে পারি না। আল্লাহ তায়াল্লা এখানে পেইড সেবাদানকারী নন যে তিনি আমাদেরকে কাস্টমার কেয়ার দিতে বাধ্য।

আমরা এই দুনিয়াতে কাস্টমার কেয়ার পেতে পেতে অভ্যস্ত। নেগোশিয়েট করতে করতে পাকা হয়ে গেছি। এই ব্যাপারটাতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়াল্লার কাছ থেকেও আমরা একই সুবিধা পেতে চাইছি! দুর্ভাগ্যবশত আমাদের তরুণদের সাথে তাদের বাবা-মায়ের সম্পর্ক অনেকটা এই কাস্টমার কেয়ার সার্ভিসের মতো হয়ে উঠছে। তাদের মা-বাবা যেন চাহিবামাত্রই তাদেরকে এই সেবা দিতে বাধ্য। যেমন : ‘মা, আমি তোমাকে বলেছি যে আমাকে একটি “গ্র্যান্ড থেফট” গাড়ি কিনে দিতে! তুমি এখনও কিনে দিচ্ছ না কেন? আমি তো তোমাকে বলেছিই যে আমি স্কুলের হোমওয়ার্ক করব!’ যেন হোমওয়ার্ক করা হলো মাকে বিনিময় দেওয়া বা সেরকম কিছু, তাই না? এর কারণ, আমরা সব সময় মনে করি এসব কিছু পাওয়া আমাদের অধিকার। তারপর আমরা যখন আল্লাহর কাছে কোনো কিছুর জন্য দুআ করি, তখনো আমাদের এই অধিকারাচ্ছন্ন মনোভাব কাজ করে। ‘ইয়া আল্লাহ, আমাকে আরোগ্য দান করুন! ইয়া আল্লাহ, আমাকে প্রোমোশন দিন! ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য এটা করুন, সেটা করুন!’ আর যখনই এসবের কিছুই ঘটে না, তখনই আপনি মনে করতে থাকেন, ‘ধুর ছাই, আমার দুআ করে কাজ নেই। এমনকী আমি অনেক সময় নিয়ে মিনতির সাথে দুআ করে চাইলাম, তবুও আল্লাহ আমাকে তা দিলেন না!’

হজরত জাকারিয়া (আ.) যখন দুআ করছিলেন, তখন তিনি কী বলছিলেন? **وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا** তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তা হচ্ছে ‘রব্বি’। কিন্তু কেন? তিনি ডাকছিলেন— ‘আমার প্রভু’ বলে। তিনি বলছিলেন— ‘হে রব, আপনি হচ্ছেন প্রভু আর আমি হলাম গোলাম। আপনার অবস্থান সবার এবং সবকিছুর ওপরে।’ কোনো ভাষাতেই এমন আর কোনো পদবি নেই যা ‘রব’ বা ‘প্রভু’র চেয়ে ওপরে। ‘প্রভু’ হচ্ছে সর্বোচ্চ পদবি, যা কখনোই আপনি হতে পারেন না। যখন আপনার একজন প্রভু থাকে, তখন আপনি হয়ে পড়েন তার গোলাম। উপরন্তু গোলামের চেয়ে নিম্নতর পদবিও আর নেই। তাই আপনি-আমি হচ্ছি সর্বনিম্ন অবস্থানে এবং আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোচ্চ অবস্থানে। সুতরাং এই সর্বনিম্ন অবস্থানে থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা আল্লাহর কাছে যখন আপনি কিছু চাইবেন, তখন আপনি অর্ডার করতে পারেন না; ঠিক যেমনটি আপনি কাস্টমার

সার্ভিসের ক্ষেত্রে করে থাকেন। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা আছি সর্বনিম্ন অবস্থানে। তাই আমাদের মনোভাব হবে এমন, ‘প্রভু, আপনি আমাকে যা দেন, যা কিছুই দেন না কেন, আমি তা-ই গ্রহণ করব। আর আপনি যদি আমাকে কিছুই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে তাতেও আমি খুশি। কারণ, আপনি সর্বজ্ঞ এবং সব বিষয়ের মতো আমার ভালো-মন্দের বিষয়েও আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।’

হজরত মুসা (আ.) ছিলেন গৃহহারা। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে উনি ফেরারি হয়ে ঘুরছিলেন। একদিন এক গাছের নিচে বসে তিনি এই বলে দুআ করছিলেন যে—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ-

অর্থ : ...হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।’ (২৮ : ২৪)

তিনি এটাই বলছিলেন যে— ‘প্রভু, আপনি আমাকে যা-ই দেবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আপনার দয়ার ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না।’

ওই মুহূর্তে তাঁর কাছে কোনো খাদ্য ছিল না, পরিধান করার মতো বাড়তি পোশাক ছিল না, বসবাস করার মতো বাড়ি ছিল না। তাঁর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার মতো উপকরণগুলো কিছুই ছিল না। তাই ওই মুহূর্তে তিনি হয়তো ভাবছিলেন, ‘যদি কিছু খাদ্য পাওয়া যেত অথবা খাওয়ার জন্য এক প্লেট ভাত পাওয়া যেত!’ উনি নিশ্চয়ই তখন এটা বলতেন না যে, ‘না না, আমি আসলে ডায়েট করছি। আমাকে বরং কিছু সালাদ দাও ইত্যাদি।’ এমন অবস্থা যে, তখন যা-ই পাবেন, তা-ই সাদরে গ্রহণ করবেন। যখন উনার কাছে একটি কাজের প্রস্তাব আসল, তখন তিনি এটা বলেননি যে, ‘আমি আসলে এর চেয়ে যোগ্য একজন ব্যক্তি। আমার এমন একটা কাজ দরকার, যেটা আমার যোগ্যতার সাথে যায়। তুমি যদি আমাকে এমন কোনো কাজ দাও, যেটা আমার যোগ্যতার সাথে যায় না তাহলে আমি দুঃখিত, সেই কাজ আমি করতে পারব না।’ কিন্তু না, তিনি সেটা করেননি। তিনি আল্লাহর কাছে শিক্ষা চেয়েছিলেন যে— ‘তুমি আমাকে যা-ই দেবে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।’

তাই তখন জাকারিয়া (আ.) বলছিলেন— ‘হে আল্লাহ, আপনার কাছে চেয়ে আমি কখনো দুঃখিত হইনি, মনস্কুণ হইনি, এমনকী কখনো অধৈর্যও হইনি।’ এখানে ‘শিক্কাওয়া’ শব্দটি আরেক অর্থে অধৈর্য বা তাড়াহুড়ো বোঝায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত সৈন্যরা যে শব্দটা ব্যবহার করে তাদের তাড়াহুড়ো বোঝায়, সেটিও মূল আরবি শব্দ ‘মুসহাকাত’ থেকে এসেছে। এটা দিয়ে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে? আপনি দেখবেন, কিছু মানুষ আছে এমন যে, তারা চায় তাদের দুআটা তৎক্ষণাত কবুল হয়ে যাক। সে যা চেয়েছে, তা তার এক্ষুনি চাই। যেন ইমার্জেন্সি ডেলিভারি। যখনই সে দুআ করছে, তখনই সে চায় সেই দুআ সত্যি হয়ে যাক। কিন্তু যখনই সে

দেখতে পায়, যা সে চাইছে বাস্তবে তা হচ্ছে না, তখনই সে হতাশ হয়ে পড়ে। সে হয়তো বলে বসে, ‘ধুর! কীসের দুআ? কে অযথা দুআ করে? দুআ কোনো কাজের না!’ আল্লাহ মাফ করুন।

হজরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর সংকটময় পরিস্থিতিতেও যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, সে কথাই যাওয়ার আগে আমি আপনাদের সাথে আরেকটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। এমন কিছু মানুষ থাকবে, যারা শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সামনে এসে বলবে—

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ-

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি।’ (২৩ : ১০৬)

তারা শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে এবং তারা হবে জাহান্নামী। কী কারণে তারা জাহান্নামী, তা নিজেরাই ব্যাখ্যা করবে। তারা ছিল বিশ্বাসী, কিন্তু তাদের এই বিশ্বাস তাদের জান্নাতে নিতে পারেনি। কিন্তু কেন? তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্ভোগের কারণ ব্যাখ্যা করবে এভাবে— ‘হে আল্লাহ, আমাদের দুর্দশা, আমাদের বিষণ্ণতা এবং আপনার প্রতি আমাদের নেতিবাচক মনোভাব আমাদের পাকড়াও করে ফেলেছিল। আমরা আপনার প্রতি যে মনোভাব পোষণ করতাম, আপনার দয়ার প্রতি আমরা এতটাই হতাশ ছিলাম যে, আমরা আপনার রহমত ও দয়া সম্পর্কে ভাবারই অবকাশ পেতাম না। আপনার কাছ থেকে আমাদের ভালো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশাই ছিল না এবং এটা আমাদেরকে হতাশ ও বিভ্রান্ত করে রাখত। সর্বোপরি আমাদের এরূপ মনোভাব আমাদের সবার চোখে নিজেদেরকে চরম অসুখী আর অভিশপ্ত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে রাখত।’

বর্তমান পৃথিবীতে যেসব মুখরোচক বিষয় বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যুবসমাজের মধ্যে নাস্তিকতার প্রসার। সারা পৃথিবী জুড়েই এমন একটা যুবসমাজ বেড়ে উঠছে, যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়। এটা শুধু আমেরিকাই নয়, এই ঘটনা ঘটছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাসহ প্রায় সারা পৃথিবীতেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যদি সাম্প্রতিক সময়ের নাস্তিকদের জীবনপ্রণালি লক্ষ করেন, তবে দেখবেন তারা অধিকাংশই অতিরিক্ত নেশাসক্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কারণ, তারা প্রায় প্রত্যেকেই চরম মাত্রার বিষণ্ণতায় আক্রান্ত। যখনই তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তাদের জন্য অবশিষ্ট রইল শুধুই দুর্দশা ও বিষাদ। তাদের জীবনে একরাশ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

দুআ বিষয়টি অতি স্পর্শকাতর। আপনি যে দুআই করছেন ও করবেন, দুআর ব্যাপারে আপনার মনোভাব যদি সঠিক না থাকে, তবে আপনার সেই দুআ উলটো আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর সব ঠিকঠাক করতে পারলে দুআ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে আমাদের বন্ধন দৃঢ় করবে এবং সম্পর্ক মজবুত করবে।

আসুন, এবার আমরা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ব্যাপারটা লক্ষ্য করি। তিনি তখন তাঁর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। কারণ, তাঁর বাবা এবং পুরো সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তি পূজা করত। তখন তিনি বলেছিলেন—

وَاَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ اَلَّا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا-

‘আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।’ (১৯ : ৪৮)

অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিলেন, আমি তোমাদের সবাইকে ত্যাগ করছি। আমি তোমাদের সেসব কিছুকেও ত্যাগ করছি, আল্লাহ ব্যতীত যেগুলোর উপাসনা তোমরা করে থাকো। আমি আমার প্রভুকেই ডাকছি এবং তাঁর কাছেই দুআ করছি। এর পরে উনি যে কথাটি বলেছেন, তা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যময়। তিনি বলেছেন— ‘আমি আশাবাদী যে, আমি যখন আমার প্রভুর কাছে দুআ করব, তখন আমি বিমুখ হব না।’ তিনি ‘আশাবাদী’ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কেন? জাকারিয়া (আ.) তাঁর দুআতে এই ‘আশাবাদী’ শব্দটা ব্যবহার করেননি। তিনি অতীতের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে বলেছেন— ‘আপনার কাছে চেয়ে আমি কখনো নিরাশ হইনি।’ কিন্তু ইবরাহিম (আ.) ছিলেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আস্থার কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন— ‘ইয়া আল্লাহ, আমি দ্বিধাহীনভাবে আশাবাদী যে, এমন সময় কখনোই আসবে না, যখন আমি আপনার কাছে কোনো কিছু চেয়ে নিরাশ হয়ে যাব।’ তিনি এখানে খুব নম্রভাবে কথা বলছেন। তিনি নিজেকে সর্বোত সঠিক ভাবেননি। শুধু ভাবছেন, আমি সঠিক পথে থাকার দুআ করে যাব। এই ‘আশাবাদ’ শব্দটার মাধ্যমেই তিনি তাঁর প্রতি করা অত্যাচার ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলেন, ‘আমি অনেক নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করে দুআ করার পরও কেন আমার দুআর কোনো প্রত্যুত্তর পাই না? আল্লাহ তো আমার কোনো দুআই কবুল করছেন না। তাহলে, এসব দুআ-দুরূদ সম্পর্কে আমার এখন কী ভাবা উচিত, কী করব এখন?’

প্রথমত, আমাদের এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহ শুধু আপনাকে নয়; একইসঙ্গে তাঁর সৃষ্টিজগতের সবাইকেই অবিরত দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাসীদের যেমন দিয়ে যাচ্ছেন, অবিশ্বাসীদেরকেও সমান হারে দিয়ে যাচ্ছেন। অবিশ্বাসীরাও চাকরি পায়, তাদেরও সন্তান-সন্ততি হয়, তাদের জীবনেও সুখ আছে, তাদের ডাইনিং টেবিলেও খাবার-দাবার থাকে, তাদেরও চাকরিতে প্রমোশন হয়, তারাও অসুস্থ হয় এবং অতঃপর সুস্থতা লাভ করে। যারা আল্লাহর কাছে দুআ করে তাদের জীবনে যেমন সমস্যা আছে, যারা কখনো দুআ করে না তাদের জীবনেও সমস্যা এবং প্রতিকূলতা আছে। আল্লাহ তাঁর পুরস্কার ও রহমত শুধু বিশ্বাসীদেরকেই দেন না; অবিশ্বাসী,

কাফির এবং সবচেয়ে খারাপ লোকদেরও দেন। তিনি দিতেই থাকেন, দিতেই থাকেন, এবং তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কখন কাকে কতটুকু দেবেন।

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

‘...আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন...’ (২ : ২৪৫)

আল্লাহ কখনো দিয়ে দেন, আবার কখনো ফিরিয়ে নেন। আল্লাহ কখনো আপনার বাজেটকে সংকুচিত করেন, কখনো আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটান, কখনো আপনাকে কিছু সমস্যার মোকাবিলা করতে দেন, কখনো আপনাকে সমস্যা থেকে মুক্তি দেন। সবকিছুই আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। তাহলে প্রশ্ন আসে, আল্লাহ যদি সবাইকে দিয়েই থাকেন, তবে তাঁর কাছে আলাদা করে এসব দুআ করার মানে কী?

দুআর ব্যাপারটা হচ্ছে মূলত এটা স্বীকার করে নেওয়া যে, আল্লাহ হচ্ছেন দাতা এবং আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। ফেরাউনের সময়কালে মুসা (আ.) তাঁর কওমের উদ্দেশ্যে যে কথাটি বলেছিলেন—

وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ-

‘আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি।’ (৪০ : ৪৪)

এই একটি কথাতে দুআর ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। আর দিনশেষে আমরা দুআ বলতে যা বুঝব, তা এই কথাটির মধ্যেই লুকায়িত আছে। আসুন, ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা করি।

আরবিতে ‘আল-তায়ফইদ’ অর্থে বোঝায় কোনো কিছু সম্পূর্ণরূপে অন্যের হাতে সমর্পণ করা। যেমন কেউ যদি কোনো কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্য কারও হাতে দিয়ে থাকে, তখন এই ‘তায়ফইদ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রাচীন আরবিতে ‘বায়নি ওয়া-বায়নাহু ফাওয়াদা’ এবং ‘ফাওয়াদা’ একই মূল থেকে উৎসারিত। এর অর্থ— এক ব্যক্তির সাথে আমার একটি পার্টনারশিপ আছে, আর সে তার অংশের কাজ খুব ভালোভাবেই দেখাশোনা করতে পারে। অন্য অর্থে বলতে গেলে, আমি এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছি এবং আল্লাহই এই ব্যাপারটি আমার চেয়ে ভালোভাবে দেখাশোনা করবেন— এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখছি। এখানে আল্লাহ কোনো তৃতীয় পক্ষ নন; বরং এমন কেউ যার সাথে আমি আমার সমস্যাটি শেয়ার করছি। স্বয়ং আল্লাহও সে পরিস্থিতির অংশ, যেখানে আমি আছি। আমি যা অনুভব করি, তা আল্লাহ আমার চেয়েও ভালোভাবে অনুভব করেন। আমি যদি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকি, তবে আমার মনে রাখা উচিত যে তা আমি স্বয়ং আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছি। আমি এটাও মেনে নিই যে আমি আল্লাহর কাছে যা চাই, সে ব্যাপারটি আল্লাহ যথেষ্ট গুরুত্বের

সঙ্গেই বিবেচনা করেন। আমি কোনো কিছু যেভাবে চাই, তিনি ঠিক সেভাবে দেন না- শুধু এ কারণে কেউই দাবি করতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে গুরুত্ব দেন না।

এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমানের অংশ।

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا-

‘ফেরেশতারা বলছিল, “প্রভু, আপনি আমাদের যা যা শিখিয়েছেন, সেসব ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই।” (২ : ৩২)

আল্লাহর নামের মধ্যে একটি হচ্ছে ‘আল-আলিম’ বা সর্বজ্ঞাত। অর্থাৎ যিনি সবকিছুই জানেন। এখন আমি-আপনি ধারণা করে ভাবি, আমরা অনেক কিছু জানি; কিন্তু প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। এখানে একটি পার্থক্য লক্ষণীয় যে, আল্লাহ যখন বলেন-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا-

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানো না।’ (১৬ : ৭৮)

অর্থাৎ তখন তো নয়ই, এখনও তোমরা কিছুই জানো না এবং আল্লাহই সব জানেন- এটা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

আসুন, ব্যাপারটা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখি। আমি মনে করি, আমার জন্য কোন জিনিসটা সবচেয়ে ভালো হবে তা কেবল আমিই জানি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আমার জন্য কোনটা সর্বোত্তম তা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই ভালো জানেন। আমি মনে করে বসি আমার স্বাস্থ্য আরেকটু ভালো হতে পারত, ওই চাকরিটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, আমার জীবনের বর্তমান সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেই বেঁচে যাব। কিন্তু সকল সত্য তো আল্লাহই ভালো জানেন; কীসে আমার কল্যাণ আর কীসে আমার অকল্যাণ।

যখন দুআ করি, তখন নিজের জন্য যেটা ভালো হবে মনে করি, সেটা চেয়েই দুআ করি। মানুষ হিসেবে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারাই আল্লাহর কাছে চাই। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে তিনি আমার দুআর উত্তর দেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমেই। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর জ্ঞান আমার-আপনার সবার চেয়েও বেশি। তাই এটাই বোধ হয় আমাদের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তিনি আমার-আপনার চাওয়ার ওপর ভিত্তি না করে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতেই দুআগুলোর উত্তর দিয়ে থাকেন।

ইসলামের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর উদাহরণ হচ্ছে ইসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিদের ঘটনা।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا آتَيْنَاكَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ-

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাজিল করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।’ (৩ : ৫৩)

তারা এভাবেই চেয়েছিল- ‘আল্লাহ আমরা ঈমান এনেছি, আপনার বাণীবাহক ইসা আলাইহিস সালামকে অনুসরণ করছি, আমাদেরকে আপনার তালিকার সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।’ আর হজরত ইসা (আ.)-এরও সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছিল।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ-

‘যেমন ইসা ইবনে-মরিয়ম তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিল, “আল্লাহর পথে (লোকদের ডাকতে) কে আমার সাহায্যকারী হবে?” শিষ্যরা বলেছিল- “আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।” (৬১ : ১৪)

পরবর্তী সময়ে একই আয়াতে আল্লাহ বলেন-

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ-

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।’

এখানে আয়াতের শেষের অংশে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ ইসা (আ.)-এর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে কথাটি বলছেন- ‘আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি যোগালাম।’ কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে ইসা (আ.)-এর অনুসারীরা যারা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা প্রায় সবাই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীকাল ধরে তাঁরা প্রায় ইতিহাসে নিখোঁজ ছিলেন। অন্য কথায় বলতে হয়, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নিজ পন্থায় সাহায্য করেছিলেন (ইতিহাসে বিস্মৃত রেখে এবং যথাসময়ে ইতিহাসে ফিরিয়ে এনে)। আর সেটা আমার বা আপনার সুবিধাজনক সময়ে নয়। আল্লাহ যে সময়টাকে উপযুক্ত মনে করেছেন, সেই সময়েই তারা ইতিহাসের পাতায় ফুটে উঠেছে।

ইবরাহিম (আ.) দুআ করেছিলেন যেন তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে একজন পরবর্তী প্রজন্মে উত্থিত হয়, যে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহর বাণীসমূহ মানুষকে শোনাবে। এই আয়াতে দেখুন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও

হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা।’ (২ : ১২৯)

ইবরাহিম (আ.)-এর এই দুআ ছিল একেবারেই আন্তরিক, অকৃত্রিম আর খাঁটি। কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশিত সন্তান না ছিল ইসমাইল (আ.), না তাঁর সন্তান, না তাঁর সন্তানের সন্তান। অনেক অনেক বংশধর পার হয়ে ইবরাহিম (আ.)-এর সেই দুআ পূর্ণতা লাভ করেছিল। ঠিক তখন, যখন আল্লাহ মনে করেছিলেন এটাই সর্বোত্তম সময়। আর সেটা ছিল শেষ নবি মুহাম্মাদ (স.)-এর সময়; যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেছিল এবং যখন তাঁকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছিল। কারণ, কোনটা সর্বোত্তম সে সিদ্ধান্ত আল্লাহ নেন। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যা আমি-আপনি জানি না।

প্রথমত, দুআ করার সময়ে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা মোটেও আল্লাহকে কোনো কিছুর জন্য হুকুম করার অবস্থানে নেই। দ্বিতীয়ত, আমি আল্লাহর কাছে যা কিছুর জন্যই প্রার্থনা করি, তা যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা যেন পাই আর যদি অকল্যাণকর হয়, তবে যেন আমি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখি। কখনোই এটা মনে করবেন না যে, আপনিই একমাত্র এমন পরিস্থিতির শিকার। আমরা যত ভালো বা খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যাই না কেন, তা কোনো না কোনোভাবে কুরআনের কোনো না কোনো ঘটনার সাথে মিলে যায়। নবি-রাসূলগণ আমাদের চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন।

আপনাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তারা এই আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন, যখন আইয়ুব (আ.) বলছিলেন—

أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ-

‘আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’

(২১ : ৮৩)

এই কথার মধ্যেই দুআ চলে এসেছে। আইয়ুব (আ.) আল্লাহর দিকে বিনয়াবনত হয়ে বললেন— ‘আমি কষ্টে জর্জরিত হচ্ছি।’ তিনি এটা বলেননি যে, ‘হে আল্লাহ, আমাকে আরোগ্য দান করুন।’ কারণ, তিনি তো জানেন না, আরোগ্য লাভই তাঁর জন্য সর্বোত্তম কি না। উনি শুধু বিনীত চিত্তে আল্লাহকে এতটুকু বললেন— ‘ইয়া আল্লাহ, আমি নিশ্চিত জানি, এমন কেউ নেই যে আমাকে আপনার চেয়েও বেশি ভালোবাসা, দয়া এবং স্নেহ দেখাবে। আমার এই ব্যথা আমার বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়নি এবং তা আপনার প্রতি আমার আস্থাও কমিয়ে দেয়নি।’

অধিকাংশ মানুষ যখন সামান্যতম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায়। আমি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমরা সত্যিকারের দুআ করতে পারি এবং সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত থাকি, যারা সত্যিকারের তাওয়াক্কুলকারী। আমি আল্লাহর কাছে এই

প্রার্থনাও করি, আমরা যেন তাদের মতো না হই, যারা খুব দ্রুতই আল্লাহর প্রতি নিরাশ হয়ে যায়। আমাদের দুআ যেন আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং সেই সকল মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে, যাদেরকে আল্লাহ দুআর মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করার তৌফিক দিয়েছেন। আমি কোনো কিছু চাওয়া মাত্রই আল্লাহ যদি তাৎক্ষণিকভাবে তা না দিয়ে দেন, তবে যেন আমি বলতে পারি, নিশ্চই আমার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। আর এটাই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রশান্তির জায়গা।

নিজেকে এ প্রশ্ন করা বন্ধ করুন যে, ‘আমি যা চাচ্ছি, তা পাওয়ার জন্য আমি কী করেছি?’ এটা পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না, নিজেকে সে প্রশ্নও করবেন না। আল্লাহ কখনোই আপনাকে ঘৃণা করেন না এবং আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করেও যাননি। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন সর্বোত্তম উপায়ে। আপনার জীবনে যত ভালো অভিজ্ঞতা আছে, আপনি জীবনে যত ভালোবাসা উপভোগ করেছেন, আমাদের পরিবারে যে ফুটফুটে বাচ্চারা আছে— সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। এসবের কোনো কিছুই আমাদের সৃষ্টি নয়। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত উপহারসমূহ দিয়ে থাকেন। কারণ, তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

আপনার জীবনজুড়ে যা কিছু আছে, তা যদি আপনি মূল্যায়ন করতে শেখেন, তবেই আল্লাহর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাবে। আপনি আর অভিযোগ করবেন না। তাই আমি নিজেকে এবং আপনাদের সবাইকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ‘আমি আরও ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য!’ এই ধরনের মনোভাব মোটেও ভালো নয়। এটা মোটেও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি নয়। একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন আমরা কীসের যোগ্য।

সর্বোপরি আমাদের এটা মনে রাখাই সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক যে, আমরা কোনো কিছুর জন্যই যোগ্য না। একজন দাস যেমন তার প্রভুর কাছে কিছু আবদার করতে পারে না, তেমনি আমরাও আল্লাহর কাছে কিছু আবদার করে বসে থাকতে পারি না। তেমনি প্রভু যা দেন, তাতেই যেমন দাস খুশি থাকে, আমাদেরও আল্লাহর দেওয়া পুরস্কারসমূহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আমরা যা কিছুই ভালো কাজ করি না কেন, তার জন্য তিনি পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ আমাদের সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন যারা কৃতজ্ঞ, বিনয়ী, আন্তরিক এবং যাদের দুআ কবুল হয়।

তৃতীয় পর্ব

আমাদের আর্থিক লেনদেন

অর্থ উপার্জন

আমরা এখন আল কুরআনের সূরা আহজাবের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব। এ সূরাটি নাজিল হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার কিছুদিন পর। এর পটভূমি কিছুটা আলোচনা করতে চাই, যেন আলোচ্য বিষয়টি বোঝা সহজ হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়। মুসলমানরা মক্কায় একটি একত্ববাদের দর্শন নিয়ে অহিংস প্রতিবাদী সমাজসংস্কার আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনো পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকী তাঁরা প্রকাশ্যে ইবাদাত করতে পারত না; বরং সেখানে তাদের অত্যাচারিত ও অবহেলিত গোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকার লড়াই করতে হচ্ছিল। হিজরতের আগে-পরে মদিনার কয়েকটি গোত্র ইসলামের প্রাণসত্তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হলো। তারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের নেতা হিসেবে বরণ

করে নিল। তিনিও একটা পর্যায়ে হিজরত করে ‘মেয়র’ (বর্তমান সময়ের মতো) হিসেবে মদিনা নগরীর দায়িত্ব নিলেন।

মদিনায় ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম ছয় মাসে এই সংক্রান্ত কাজের পর থেকে বিভিন্ন অনুশাসনমূলক আইন নাজিল হতে থাকে। লক্ষ করে দেখবেন, বেশিরভাগ মাক্কি সূরায় (যেগুলো কুরআনের দুই-তৃতীয়াংশ) মূলত কোনো আইন-বিধান নাজিল হয়নি। মাঝে মাঝে কিছু আদেশনামা আছে, কিন্তু শরিয়াহর কোনো বিধিবিধান তখনও নাজিল হয়নি। মদিনায় আসার পরই মূল শরিয়াহ বিধানগুলো নাজিল হওয়া শুরু হয়।

এই সূরাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে তা হলো, এর বিষয়বস্তু। মুসলিম সমাজ তখন কেবল শিশুতুল্য, কিন্তু একদিন এই সমাজই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হতে যাচ্ছে। এমনই এক সভ্যতা এদের হাতে তৈরি হবে, যা সব মহাদেশ আর জনগোষ্ঠীতে ব্যাপ্ত হবে। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে এমন কিছু আদেশ প্রেরণ করছেন, যাতে তারা একটি সঠিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে করুন, আপনি একটি উঁচু বিল্ডিং করতে চাইছেন, তার ভিত্তি যতই গভীরে প্রোথিত হবে, বিল্ডিংটি ততটাই মজবুত হবে। ভিত্তিতে মজবুতি থাকলে বিল্ডিং উঁচু করতে পারবেন। এই উপমা আমাদের বিশ্বাসের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমাদের বিশ্বাসও গভীরে প্রোথিত হতে হবে। বিশ্বাসের বিভিন্ন অনুষ্ণকে ভালোমতো বুঝে নিয়ে তার ওপর দৃঢ় হতে হবে; যেন আমাদের কাজকর্মে তার প্রতিফলন দেখা যায়। এ হলো একটি দিক। এই কথাটি শরিয়াহ আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত প্রাথমিক বিধানগুলো দিয়ে পরবর্তী আইন-কানুনসংক্রান্ত বিধানগুলোর জন্য বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে।

একেবারে প্রাথমিক মুসলিম সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দেখুন। আল্লাহ বলছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।’ (৪ : ২৯)

অর্থাৎ তোমরা যারা ঈমানের দাবি করো, তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও সন্দেহপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। সূরা বাকারাতের আল্লাহ বলেছেন—

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

‘তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। আর অন্যায়ভাবে অপরের ধন হস্তগত করার উদ্দেশ্যে শাসকদের সম্মুখে অন্যের সম্পদ পেশ করো না।’

(২ : ১৮৮)

এখানে আরও অগ্রসর হয়ে বলা হচ্ছে, ধোঁকা দিয়ে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তাদের নিঃস্ব করে দিও না। শাদিকভাবে এ কথার অর্থ হলো, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ হস্তগত করো না। এতে আরও যোগ করা হয়েছে, সরকার বা প্রভাবশালী কাউকে প্রভাবিত করে মানুষের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিও না। অর্থাৎ রাজনীতি যখন ব্যবসায় পরিণত হয়ে যায়, তখনই দুর্নীতি শুরু হয়ে যায়। সেজন্যই ধনী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতিবিদদের পকেটে রাখতে পারে। আর এর মূল্য শোধ করে সাধারণ নাগরিকরা।

বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো মানুষকে অসচেতন রেখে সরকারের সহায়তায় মানুষের সম্পদ লুটে নেয়। কখনো এ কাজে আইনকেও ব্যবহার করে, যা সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝেও না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আজ এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলছি। অথচ আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ এ নিয়ে কথা বলেছেন।

মুসলমানদের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা জনগণের সম্পদ লুট করবেন না। রাজনীতিবিদদের আপনার লেনদেনে জড়িত করবেন না। একটা সমাজব্যবস্থা চালু করতে হলে ব্যবসা লাগবে, পারস্পরিক লেনদেন হবে, দোকানপাট খুলতে হবে, বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা শুরু হবে। তাই পরস্পরের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হবে। আল্লাহ বলেন, সবার আগে সেসব লেনদেনে যথার্থতা থাকতে হবে। ভেবে দেখুন, ওহি নাজিলের শুরুতে আল্লাহ বলেননি যে, কারও সাথে দেখা হলে সালাম দিও। অথচ এসব ইসলামি আচরণের খুবই জরুরি দিক। কিন্তু আল্লাহ সবার আগে বললেন আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে। এটা আমার কাছে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় মনে হয়। উপরন্তু এখানে শর্তও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, ‘যতক্ষণ না তোমাদের উভয় পক্ষ লেনদেন করতে সম্মত হও।’ ব্যবসা যেমনই হোক, বৈধ ব্যবসা করতে হলে এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটি স্বচ্ছ চুক্তিনামা থাকতে হবে। এ নির্দেশনা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

আপনি পুরাতন গাড়ির ডিলারের দোকানে ঢুকেছেন। বিক্রয় প্রতিনিধিরা তাদের গাড়ির ভালো দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। গাড়ির দৃষ্টিনন্দন রং, ঔজ্জ্বল্য নিয়ে কথা বলছে। অথচ সে গাড়ির চলন ক্ষমতার কথা বলতে চাইবে না। কারণ, হয়তো গাড়িটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল। সে আপনাকে কথায় ভুলিয়ে, হয়তো কিছু ছাড় দিয়ে সে খুঁতটা ঢাকার চেষ্টা করবে। এ ধরনের লেনদেনের কথা আল্লাহ বলেছেন। জানেন, সে কি করছে? সে যে করেই হোক, একটা গাড়ি বিক্রি করতে চাইছে।

এজন্য আপনাকে ছোটো ছোটো লেখা সংবলিত এক তাড়া কাগজও দেওয়া হবে, যা আপনি পড়েও দেখবেন না। পড়লে হয়তো কখনো গাড়ি কিনতেন না। এর মানে হলো, বেশিরভাগ মানুষই লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখে না।

আরেকটি উদাহরণ দিই। আপনি একটা বাণিজ্যিক ভবনে একটা অফিস ভাড়া করলেন। চার বছরের জন্য প্রতি বর্গফুট আটশো টাকা ভাড়া ধরে চুক্তি করলেন। দুবছর পর হঠাৎ তারা আপনাকে বলল, ‘দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে, তাই আমরা এখন প্রতি বর্গফুট এক হাজার টাকা নেব।’ আপনি অবাক হয়ে কৈফিয়ত চাইতে গেলে তারা আপনাকে জবাব দেবে, চুক্তির ৭ নং পৃষ্ঠায় ৫২ নং লাইনে ছোটো করে লেখা আছে, ভাড়া মার্কেট দরের সাথে সংগতি রেখে বদলানো হবে। সে লেখা পড়তে আপনাকে হয়তো একটা মাইক্রোস্কোপ জোগাড় করতে হবে। এজন্য আল্লাহ বলছেন, লেনদেনে উভয় পক্ষ জেনেশুনে একমত হয়ে তবেই স্বাক্ষর করবে।

শুধু ব্যবসা নিয়ে না ভেবে নিজেদের অবস্থান নিয়ে ভেবে দেখা যাক। আপনারা সকলেই হয়তো পেশাজীবী। কন্ট্রাক্টর, প্রোগ্রামার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী। ধরা যাক, আপনি একজন প্রোগ্রামার। আপনার বস আপনাকে একটা কাজ দিলেন আর বললেন যেন শেষ করেই তাঁকে রিপোর্ট করেন। আপনার কাজের স্বাধীনতা আছে কারণ বস তো আপনাকে সপ্তায় সাত দিন আর দিনের চব্বিশ ঘণ্টা দেখে রাখছেন না। আপনি বিশ মিনিটেই কাজ শেষ করে ফেললেন আর বাকি দিনের জন্য অবসর হয়ে গেলেন। অনেকে আবার অফিসে গিয়ে ইউটিউবে কুরআন শোনেন। অনেক কর্পোরেট অফিসে এখন ইউটিউবের ব্যবহার সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। তাতে কী? আপনার ফোনে তো ফোর-জি আছেই। ভেবে দেখুন, অফিসের কাজটুকুর জন্য আপনাকে বেতন দেওয়া হচ্ছে। সেটা শুধুই আপনি এবং আপনার বসের মধ্যকার বিষয় নয়। আল্লাহ বলছেন, সেখানে তিনি আছেন। আপনার হাতে কোনো কাজ না থাকলে সেটা বসকে জানান। কিছুদিন যদি এমন কাজ ছাড়া থাকেনও, তাতে সমস্যা নেই যদি আপনি সেটা জানান।

আবার এমনও হতে পারে, আপনার কোম্পানি অন্য কারও থেকে একটা কাজের জন্য ছয় মাস সময় নিয়ে কাজ এনেছে আপনি সে কাজ দুই মাসে সেরে ফেললেন। অথচ সে কাজ ছয় মাস পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হলো, বিল আদায়ের জন্য।

এ কাজগুলো অনৈতিক। সবাই এটা করে— এই বলে আপনি সবার মতোই অবৈধ কাজ করতে থাকবেন না। কারণ, আপনার বিবেক আছে। আর আপনাকে এক উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করার কৈফিয়ত দিতে হয়। একইভাবে প্রতিষ্ঠানের মালিক যারা, যাদের অধীনে অনেক লোক কাজ করে তাদেরও এই বৈধতার কথা মনে রাখা উচিত। তাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত, অধীনস্থ লোকদেরকে কী কী কাজ দেওয়া হচ্ছে, কোনটা আবশ্যিক, কোনটা ঐচ্ছিক, এজন্য কী বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে, কারও ওপর অযথা চাপ দেওয়া হচ্ছে কি

না ইত্যাদি। এসব বিষয় কাচের মতো স্বচ্ছ থাকা উচিত। মুসলিম সমাজের প্রথম সোপান এই নৈতিকতার চর্চা। আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, আয়-উপার্জন নিয়ে ভাবতে। কারণ, আমরা যখন আয়-উপার্জনের উপায় নিয়ে ভাবি না, তখনই এর নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে যায়, এর মধ্যে আর সততা থাকে না। আর এভাবে আয় বাড়তে গিয়ে মানুষ অপরের ভালোমন্দের কথা ভুলে যায়। মানবীয় বিবেকের মৃত্যু ঘটে।

এজন্যই এই আয়াতের পরবর্তী কথাগুলোয় আল্লাহ বলেছেন—

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا-

‘যে ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম করবে, তাকে আমরা নিশ্চিত আগুনে নিক্ষেপ করব। আর আল্লাহর জন্য তা কঠিন কাজ নয়।’ (৪ : ৩০)

আল্লাহ এত কঠিন ভাষায় কেন বললেন? এ তো অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়নি; বরং শুরুতে ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করেই কথা শুরু করেছেন। কেন ঈমানদারদের প্রতিই তাঁর এ কঠোর অবস্থান? তাদেরকেই আল্লাহ বলেছেন, ঈমান তোমাদের জামার কলারের মতো শোভাবর্ধনের বস্তু নয়। নিজেদেরকে কেবল মুসলিম নামে অভিহিত করা, আর কাজকর্মে মুসলমানিত্বের ছাপ না থাকা— এটা অনুচিত। ঈমান কেবল একটি ঘোষণা নয়; বরং ঈমান হলো একটি সার্বিক পরিবর্তন, যার মাধ্যমে জীবনধারায় পরিবর্তন আসবে, কাজকর্মের পদ্ধতি বদলাবে, এর মাধ্যমেই পারস্পরিক লেনদেনের ধরন নির্ধারিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কী শক্তিশালী একটি কথা!

আমি এখন শেষ আয়াতটি নিয়ে কথা বলতে চাই। তার আগে আসুন একটি সুন্দর ব্যাপার ভেবে দেখি। কেন আল্লাহ আমাদের অত শত আইন-কানূনের শিক্ষা দিচ্ছেন? আগের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا-

‘আল্লাহ তোমার ওপর থেকে বিধিনিষেধের বোঝা হালকা করতে চান। কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে তৈরি করা হয়েছে।’ (৪ : ২৮)

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের বোঝা হালকা করতেই চান। কারণ, মানুষকে তিনিই দুর্বল করে বানিয়েছেন। আর তিনিই আমাদের জন্য অল্প কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছেন, যেন আমাদের জন্যই জীবন সহজ হয়ে পড়ে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এর চেয়ে কোনো সংক্ষিপ্ত পথে কোনো একটা কৌশলে যেনতেনভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়াটা আপনার জন্য সহজ হবে। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছেন, ভুল করে টাকা-পয়সার মালিক হলে সেটা উলটো বিপদ হয়ে আপনার দিকেই আসবে। আর সে অভিশপ্ত টাকা কিংবা সম্পদের মূল্য আপনাকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের ক্ষতি দিয়েই দিতে হবে।

সন্দেহযুক্ত পথে আয়-উপার্জন করলে মুসলিম হিসেবে আমাদের মনে অপরাধবোধ জাগে। আমরা সে টাকার একাংশ মসজিদে দান করি। মদের দোকান করি অথচ জানি যে কাজটা হারাম। সুতরাং ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে একটা আয়াতুল কুরসি লেখা কাগজ ঝুলিয়ে রাখি। হয়তো রমজানের সময় মসজিদে দশ হাজার টাকা দান করে দিই। জেনে রাখবেন, এ টাকা অপবিত্র। এ দিয়ে মসজিদের বিল্ডিং বানানো হচ্ছে, কার্পেট কেনা হচ্ছে, পর্দা ধোয়া হচ্ছে। কিন্তু বছরখানেক পর দেখবেন, সে মসজিদে হয়তো ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, লোকেরা একে অপরকে ভালোবাসে না। কারণ, হালাল পয়সায় যেমন বারাকাহ আসে, রহমত আসে, তেমনই হারাম পয়সায় আসে অভিশাপ, অকল্যাণ। কারণ, বিষ খেয়ে আপনি কখনো স্বাস্থ্যের উন্নতি আশা করতে পারবেন না। এটা বোকামি। আল্লাহর নিয়মই এরকম।

সর্বশেষ আয়াতটি দেখি। সুন্দর একটা আয়াত। আজ আমরা মুসলিম উম্মাহ যদি এটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা এখনকার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে থাকত। আল্লাহ বলছেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا-

‘তোমরা যদি সেইসব বড়ো বড়ো গোনাহের কাজ হতে বিরত থাকো, যা থেকে তোমাদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোটো ছোটো দোষত্রুটি তোমাদের হিসেব থেকে মুছে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানের স্থানে আসীন করব।’ (৪ : ৩১)

আল্লাহ বলছেন, যেসব গুনাহ বড়ো যেমন : হত্যা, ধর্মদ্রোহিতা, শিরক অর্থাৎ কবিরী গুনাহগুলো যদি তোমরা এড়িয়ে যাও, তাহলে আমি ছোটো ছোটো গুনাহগুলো মাফ করে দেবো। এসব কবিরী গুনাহর আগেও আল্লাহ তায়ালা আরও দুইটি অন্যায়ের কথা বলছেন? আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতা এবং হত্যা। এর অর্থ হচ্ছে আমরা পরস্পরের সাথে কেমনভাবে লেনদেন করি, সেটা আল্লাহর কাছে বড়ো ব্যাপার। সুতরাং ছোটোখাটো গুনাহগুলোকে মুছতে চাইলে অন্যান্য বড়ো গুনাহকে এড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আর্থিক লেনদেনেও স্বচ্ছ থাকতে হবে।

দেখুন, আমরা মানুষ। আমাদের এক-দুইদিন ফজরের সালাতে দেরি হতে পারে, রাগ হয়ে গেলে কাউকে খারাপ কথা বলে ফেলতে পারি, হয়তো খুব অনিচ্ছায় হলেও কোনো ভুল করে ফেলি। এগুলো সায়িয়াআহ বা পাপ। মানুষ হিসেবে আমরা এতে ঢুকে যাই কারণ, আমরা তো ফেরেশতা নই। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, বড়ো গুনাহ থেকে সতর্ক থাকলে আল্লাহ এসব গুনাহ মাফ করে দেবেন। কী অপূর্ব সুযোগ!

এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো, ছোটোখাটো অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেললে পেরেশান হবেন না। ভেবে নেবেন না যে আপনি এখনই জাহান্নামে চলে যাচ্ছেন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। কেন বলছি এসব? আমরা আসলে আল্লাহর হিসাবটা উলটে দিয়েছি। আমরা আয়-উপার্জন,

লেনদেন নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি কিছু ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে। হালাল রেস্টুরেন্ট আছে কোথায়, কোথায় হালাল উপায়ে জবাই করা গোশত পাব এসব নিয়ে। আমি বলছি না এসব গুরুত্বহীন; বরং বলতে চাইছি, এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের ভাবনা নেই। এই ভাবনা চলতে চলতে একসময় আমরা মসজিদে কারও মাথায় টুপি না দেখলে বলে ফেলি, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, তার তো সালাতই হচ্ছে না।’ আমরা এখানে টুপিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। কিন্তু দেখা উচিত, আল্লাহ কোনটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, কোন ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

সুতরাং ইসলামে আমাদের উপার্জনের উপায় নিয়ে, ব্যয়ের উপায় নিয়ে, লেনদেনের ধরন নিয়ে কথা বলা হয়েছে। অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে পরস্পরের সাথে সৌজন্যমণ্ডিত ও সম্মানজনক উপায়ে কীভাবে লেনদেন করব। তার মানে কিন্তু এই না যে শরিয়তের বাকি সব জিনিস অপ্রয়োজনীয়। হালাল গোশত, সুন্নাহ সালাত, অন্যান্য বিধিবিধান কোনোটিই অপ্রাসঙ্গিক নয়; বরং এগুলো একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে পালন করার বিষয়, অন্য মুসলিমদেরকে যাচাই করার মাধ্যম না। কিছুতেই এসবের ভিত্তিতে কাউকে বিভিন্ন নাম দেওয়া যাবে না, বিভিন্নভাবে ছোটো করা যাবে না। অমুক প্যান্ট পরে এভাবে, তমুক দাড়ি রাখছে না, সে কীভাবে নামাজ পড়ে, ওই মেয়েটার হিজাব একেবারে হচ্ছে না ইত্যাদিতে শরিয়তের এসব বিধানকে ব্যবহার করা যাবে না। এর চেয়ে যদি ভালো কিছু বলার না থাকে, চুপই করে থাকা উচিত। কারণ, আমরা আসলেই জানি না কে কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অপরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর না দিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের নিয়েই ভাবা। নিজেদের ব্যাপারে অন্ধ না থাকা। এমন তো না যে, আপনি মুমিন হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে পাশ করে গেছেন, এখন আর নিজেকে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন নেই। এখন আপনার একমাত্র কাজ হলো, অন্যদের ভুল ধরে বেড়ানো। সমস্যাটা সেখানেই। কারণ, আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ সে গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন, এড়িয়ে যাবেন, ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেবেন, সুবহানাল্লাহ!

এটিই কুরআনের সৌন্দর্য। কুরআন আমাদেরকে অগ্রাধিকারগুলোকে ঠিক করে নিতে শেখায়। কী নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত, আর কী নিয়ে ভাবা উচিত না। জীবনে কোন ব্যাপারটিকে মূল্য দেওয়া উচিত, আর কোন ব্যাপারটিকে কম গুরুত্ব দিয়ে ভাবা যেতে পারে। কোন বিষয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসেবে ভাবুন, সুন্নাহ সালাতের কথা। কারও কাছে হয়তো সুন্নাহ আদায় করা কঠিন মনে হয়। ঠিক আছে, আপনি শুরুতে কেবল ফজরের সালাতে সুন্নাহ পড়ুন। দু-এক সপ্তাহ এটা চালিয়ে যান। সবগুলো একসাথেই শুরু করতে হবে এমন নয়; বরং আপনি আস্তে আস্তে এগোতে পারেন। কিন্তু অগ্রাধিকার কাকে বলে? আপনার উপার্জন হারাম, আপনি লেনদেনে হারাম পথ অবলম্বন করছেন। আপনি সেখানে এরকম ভাবতে পারবেন না, ঠিক আছে আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলব। না, আপনাকে এখনই এটা বন্ধ করে ফেলতে হবে। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে আদেশ পালনের ব্যাপারে শিথিলতা আল্লাহ সহ্য করেন না।

আমি আমাদের সকলের জন্য দুআ করি যেন আমরা ‘কাবিরাহ’ অর্থাৎ বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আমাদের আয় উপার্জন, লেনদেন যেন সততা এবং স্বচ্ছতার নীতিতে পরিচালিত হয়, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করা যায়। আমাদের মধ্যে যারা ব্যবসায় জড়িত আছেন, তাঁদেরকে যেন আল্লাহ যোগ্যতা, নৈতিক হিম্মত, দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনার যোগ্যতা দিন। আমি দুআ করি, মসজিদে দান করা অর্থ যেন হালাল এবং ভালো উপায়ে অর্জিত হয়। যেন তা আল্লাহর ইচ্ছায় সমাজের জন্য উপকারী হয়।

কন্যাসন্তান

এই অধ্যায়ে এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যেটি আমার দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। এটি শুধু মরুচারী প্রাচীন আরবদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল না; বরং আরও অনেক সমাজ ব্যবস্থায় এমনকী আজকের আধুনিক সমাজেও প্রচলিত। আল-কুরআনের ষোলোতম সূরা, আন নাহলে উল্লেখিত এ নিকৃষ্ট কাজটি যেকোনোভাবেই হোক মুসলিম সমাজেও অনুপ্রবেশ করেছে। এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ এটিকে মুশরিকদের কাজ হিসেবে উল্লেখ করার পরও যুগের পর যুগ ধরে নানা সমাজে, নানা বংশে এবং গোত্রে মুসলিমরাও এ কাজটি সংঘটিত করে আসছে।

যে আয়াতে এ আলোচনা করা হয়েছে, আমরা শুরুতে সে আয়াতের শেষাংশ দেখব। আল্লাহ বলছেন—

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ-

‘আর তারা যা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে।’ (১৬ : ৬২)

তারা যা নিজেরাই পছন্দ করে না, তাই আল্লাহকে দিতে চায়। কুরাইশদের এই অনুশীলন ছিল, তারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করেও মূর্তিপূজা করত। সূরা লুকমানের একটি আয়াতে ধারণাটি আরও একটু পরিষ্কার হবে।

وَلَيْسَ سَأَلَتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

‘আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।’ (৩১ : ২৫)

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার নাম জিজ্ঞেস করলেও তারা আল্লাহর নামই বলবে। অথচ একই সময়ে তারা অন্যান্য প্রভুদেরও প্রাধান্য দিত। আর উৎসর্গের সময় কী করত? উদাহরণস্বরূপ, তারা যখন খেতে বসত তখন সবচেয়ে ভালো গোশতটা নিজেদের জন্য রেখে বাকিটা কিংবা উচ্ছিষ্ট অংশটুকু তাদের মূর্তি কিংবা আল্লাহর সামনে উৎসর্গ করার জন্য রেখে দিত।

একইভাবে, আরবদের একটা জাতিগত ঐতিহ্য ছিল যে, তারা কন্যাসন্তান পছন্দ করত না। কন্যাসন্তানকে তারা অপমানজনক মনে করত। কিন্তু আল্লাহর নামে তারা কন্যাসন্তানই বরাদ্দ করত। এতে কোনো সমস্যা বোধ করত না। আল্লাহ কুরআনে এই নিয়ে বলেছেন—

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا-

‘তোমাদের রব কি পুত্র সন্তানের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করেছেন আর নিজেদের জন্য ফেরেশতাদের কন্যা সন্তান বানিয়েছেন?’ (১৭ : ৪০)

তোমরা নিজেদের জন্য ছেলেসন্তান পছন্দ করো অথচ আল্লাহ কোনোভাবে কন্যাসন্তানই নিয়ে নেবেন? এরকম অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি তোমরা কোথেকে পেলে? এর পেছনে আরও একটা মানসিকতা আছে। আল্লাহকে যা হোক একটা কিছু দিলেই হলো, এই মানসিকতা। জীবনভর তোমরা নিজেদের জন্য কাজ করবে, নিজেদের ইচ্ছেগুলোকে প্রাধান্য দেবে। আল্লাহর জন্য যেকোনো জিনিস রেখে দিলেই হলো। তোমরা নিজের জন্যই বাঁচো, আল্লাহর জন্য নয়।

এটা অনেকটা ট্যাক্স দেওয়ার মতো। মানুষ ট্যাক্স থেকে নিস্তার চায়, চেষ্টা করে এর পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে। মানুষ ভেবে নেয়, আল্লাহর পথে জাকাত দেওয়া, সাদাকাহ দেওয়া, তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করা, এমনকী আল্লাহর পথে সময় দেওয়া, এগুলো সবই হচ্ছে কেবল আল্লাহকে দিয়ে দেওয়ার বিষয়। আর এগুলো দেওয়ার পর ব্যাস, বাকি জীবনটা নিজের মতো করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এই অপরিণত অসুস্থ চিন্তার কারণেই তারা আল্লাহকে যেনতেন একটা কিছু দিয়ে দিতে চায়, যা তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না। এজন্য আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন—

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ-

‘আর তারা যা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর জয় নির্ধারণ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য শুভ পরিণাম আছে। সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং নিশ্চয়ই তারা সর্বাত্মে নিষ্কিণ্ত হবে।’ (১৬ : ৬২)

তারা আল্লাহকে সবচেয়ে কম সময় দেবে, সবচেয়ে কম ত্যাগ করবে, তাদের দানের নিকৃষ্ট অংশটা আল্লাহর জন্য রাখবে এবং তাদের জিহ্বাও মিথ্যে বলতে থাকবে। আল্লাহ এইটুকু বলতে পারতেন যে- **تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ** ‘তারা মিথ্যা বলে।’ কিন্তু তিনি বলছেন- **يَقُولُونَ عَلَىٰ كَذِبٍ** আরবিতে, **الوصف** বলতে বোঝায়, কোনো কিছুকে বর্ণনা করার যোগ্যতা। এই যোগ্যতাটা সবার থাকে না। সুতরাং আল্লাহ এখানে তাদের ব্যাপারেই কথা বলছেন, যারা ছিল বাকপটু। আল্লাহ তাদের জন্য **السنة** শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এর আভিধানিক অর্থ ‘জিহ্বাসমূহ’। এই শব্দটি কুরআনে এমন লোকদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যারা শব্দবিন্যাসে ভীষণ পারদর্শী। অর্থাৎ যারা নিজেদের এবং চারপাশের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিথ্যাকে ফুলেল সৌন্দর্যে সাজিয়ে, বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সুন্দর করে পেশ করে।

কী সেই মিথ্যা? **أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ** ‘তারা সর্বোত্তম প্রতিদান পাবে।’ অর্থাৎ তারা আল্লাহকে যা-ই দিক না কেন, এটিই আল্লাহর কাছে এতই বড়ো যে, তারা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তমের চেয়েও ভালো প্রতিদানের হকদার- এটাই তাদের মিথ্যা। **لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ** ‘নিঃসন্দেহে বলা যায়, আগুনই এদের পুরস্কার।’ **وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ** ‘আর সে আজাবে তারা চিরকাল থাকবে।’ কেবল **مدخلون** প্রবেশ করবে না, তাতে অনন্তকাল থাকতেও বাধ্য হবে। **افراط** শব্দের অর্থ সীমাকে অতিক্রম করে যায়, এমন। শুধু প্রবেশ করা নয়, তাতে চিরকাল দক্ষ হতে থাকার নামই ‘মুফরাতুন।’

এইটা কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের মধ্যে একটি, যেখানে আল্লাহ নিজের নামে শপথ করেছেন। আমরা যখন আল্লাহর নামে শপথ করি, বলি **والله** (ওয়াল্লাহি)। কিন্তু আল্লাহ এখানে সে সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। বলছেন- **تَالله** (তায়াল্লাহি)।

تَالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ-

‘আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। আজ তাই সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।’ (১৬ : ৬৩)

এই আয়াতেই আমরা দেখি যে, আল্লাহ তাঁর নিজের নামে শপথ করে বলছেন— ‘আমরা বহু জাতিকে রাসূল দিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের সবার সাথে কী করেছে? শয়তান যেভাবেই হোক, তাদের বাজে কাজগুলোকে লোকদের কাছে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে। আর লোকেরা এসব কাজ করত এবং সম্মত থাকত এই ভেবে যে, তারা উত্তম কাজ করেছে। তারা মনে করত এভাবেই তো ভাবা উচিত, চলা উচিত! সুতরাং শেষ বিচারের দিনে শয়তানই তাদের বন্ধু হবে। কারণ, শয়তান তাদের এমন বন্ধু ছিল, যার কথা তারা শুনত। যার নির্দেশিত এবং যার সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেওয়া বিষয়গুলোকে তারা গ্রহণ করেছিল।’ আল কুরআনে এগুলো খুব কৰ্কশ আয়াত, যাতে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের কথা বলা হয়েছে।

এগুলো ছিল আলোচনাটির শেষাংশের আয়াত। আমরা এখন দেখব, এ আলোচনাটি কোথায় শুরু হয়েছিল।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

‘আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তানদের নির্দিষ্ট করে। তিনি পবিত্র। আর নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে যা তারা পছন্দ করে।’ (১৬ : ৫৭)

আল্লাহ বলছেন— ‘তারা বলে আল্লাহ কন্যাসন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লাহ সে অপবাদ থেকে পবিত্র। আর তারা নিজেরা তাই নিতে চায়, যা তারা পছন্দ করে। পুত্রসন্তান, এটাই তো তারা চায়, তাই না?’ এখন এর পরের আয়াত দেখুন—

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ-

‘আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে রাগ ভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (১৬ : ৫৮)

তখনকার সময়ে সনোগ্রাম ছিল না। হয়তো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রসবের সময় সন্তান অপেক্ষায় আছে। হয়তো সে অপেক্ষায় আছে যে, একটি ছেলেসন্তানের সুসংবাদ শুনবে। এমন সময় দাই এসে জানাল, মেয়ে হয়েছে। আল্লাহ বলছেন— ‘আল উনসা, অর্থাৎ মেয়ে নয়, মেয়েটি এসেছে।’ আল্লাহর কাছে সে অনেক বিশেষায়িত। মেয়েটির জন্য এই সম্মান তার জন্ম থেকেই। অথচ অন্যদিকে যে লোকটি অপেক্ষায় আছে, কন্যাসন্তানের সংবাদ শোনামাত্রই তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। সে হয়তো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখে মেঘ নেমে আসে। এভাবে আল্লাহ এক মুশরিকের বর্ণনা দিয়েছেন। এমন একজনের, যে আল্লাহর একক অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

আপনি যখন আপনার মেয়েকে স্বীকৃতি দেন না, তখন আপনি প্রকারান্তরে আপনার মাকে স্বীকৃতি দেন না, যিনি আপনাকে দুনিয়ায় এনেছেন। আল্লাহ এখানে বলছেন, এটি হলো একজন মুশরিকের বৈশিষ্ট্য। তারাই কেবল কন্যাসন্তানের সংবাদে বিচলিত হয়। এটি একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়, যে মুমিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করে।

আপনি জানেন না, কন্যাসন্তানের ব্যাপারে কত হাদিস আছে, একের পর এক কত বর্ণনা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার নয়; বরং বারংবার।

‘তোমাদের যাদের তিনটি কন্যাসন্তান আছে, এমনকী তিনজন বোন এবং সে যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।’

‘কন্যাসন্তানের সাথে করা ভালো ব্যবহার তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।’

আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে— ‘যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়নি, কিংবা পুত্রকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দেয়নি, সে জান্নাতে যাবে।’

এর সারমর্ম হলো— এর বিপরীত আচরণগুলো আপনার আর জান্নাতের মধ্যে একটি বাঁধা তৈরি করে দেবে। আপনি পুত্র সন্তান চাইছেন। আপনি ভাবছেন, মেয়ে দিয়ে আমার কী কাজ? সে তো পরিবারের জন্য একটা বোঝা। তার পড়াশোনার জন্য খরচ করতে হবে, যার কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সে চাকরি করবে না, পরিবারে খরচ দেবে না। তাকে বিয়ে দিয়ে অন্য পরিবারে দিয়ে দিতে হবে, উপরন্তু সে বিয়ের জন্যও আমাকে খরচ করতে হবে।

এ হাদিসগুলোর অর্ধেক জান্নাতের নিশ্চিত গ্যারান্টি হিসেবে কন্যাসন্তানকে দেখাচ্ছে, আর বাকিগুলো দেখাচ্ছে পিতার সাথে জাহান্নামের পর্দা বা প্রতিবন্ধক হিসেবে। আল্লাহ এ সম্মান ছেলেসন্তানকে দেননি। আমাদের ঘরগুলোতে কন্যারা এই সম্মানের অধিকারী। যেমন : আমার চারটি কন্যা, আলহামদুলিল্লাহ। হাদিসে বলা সংখ্যা থেকেও একজন বেশি। পরপর দুইজন কন্যাসন্তানের পর যখন আবার মেয়ে হলো, আমি সত্যিই খুব খুশি হলাম। আমি মিষ্টি কিনে ইশার সালাতের জন্য মসজিদে গেলাম। মুসল্লিদের মধ্যে বিতরণ করলাম। কারণ, আমি আবার কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছি।

এক ভাই কাছে এসে বললেন, ‘মিষ্টি? বাহ! নিশ্চয়ই কোনো সুখবর?’

আমি বললাম, ‘জি ভাই, আমার মেয়ে হয়েছে।’

তিনি বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ, এর পরেরবার ছেলে হবে।’

আমার ইচ্ছে করছিল তাকে আঘাত করি। কারণ, এই কথাগুলোই তো মুশরিকরা বলত। সেই মুশরিকরা, যারা আল্লাহর একত্ববাদেই বিশ্বাস করত না, তারা। আর আপনিও এটা বলছেন!

তৃতীয় কন্যাসন্তানের জন্মের সাথে সাথে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা সেই কথাগুলোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। এর জন্য তো আমাকে স্বাগতম জানানো উচিত।

এই সময়েও আমরা পৃথিবীতে নানা সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে এ নিয়ে স্থবিরতা দেখতে পাই। শাশুড়িরা পুত্রবধূদের ওপর রাগ করছেন কেননা, তার ছেলেসন্তান নেই! এই অজ্ঞতা অকল্পনীয়। আপনি নিজেও একজন নারী। আপনি কি জানেন, কি বলছেন? আপনি কি জানেন, যা বলছেন তা কতটা অবাস্তব? তিনি পুত্রবধূকে অপমান করছেন, হুমকি দিচ্ছেন যে, ছেলেসন্তান জন্ম না দিতে পারার অপরাধে তার ছেলে আবার বিয়ে করবে। আমরা অজ্ঞতার এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এটা কি কুরআনের পথে চলা মানুষের কাজ? এটা কি তাদের কাজ যারা আল্লাহর দ্বীনের পথে আছে? আর এই অজ্ঞতা এখন শুধু অধার্মিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এ অজ্ঞতা এমন লোকদের মধ্যেও এসে গেছে যারা বড়ো দাড়ি রাখছেন, হিজাব পড়ছেন কিংবা কুরআন মুখস্থ করছেন। দ্বীন তাঁদের সব জায়গায় আছে, শুধু এই একটা বিষয় ছাড়া। তারা এই আয়াতগুলো নিয়ে কী ভাবছেন? কোথায় চলে গেছেন?

ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا (তার মুখমণ্ডল অন্ধকার হয়ে যায়), সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর আল্লাহ বলছেন— ‘সে প্রায় বাকহীন হয়ে পড়ে, তাকে দেওয়া এই দুঃসংবাদ শুনে। আর ভাবতে থাকে, আমাকে কেন স্বাগত জানানো হচ্ছে? আমার জন্য দুঃখিত হও! হায়, আমাকে যদি কখনোই জানানো না হতো!’ আর তারপর আল্লাহ বলছেন— ‘وَهُوَ كَظِيمٌ’ আর সে ক্রমাগত রাগ লুকাতে থাকে। সে ভেতরের কথা প্রকাশ করে না।’ كَظُمَ দিয়ে আরবিতে রাগ হজম করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। সারাক্ষণ সে এমন মুখভঙ্গি করতে থাকে যেন, বিশ্বাস কিছুর স্বাদ নিচ্ছে। সে নবজাতকের কান্না শোনে, আর বিরক্ত হয়, এটা তাকে মহাবিরক্ত করে ফেলে। এট তার জন্য অপমানের মতো। উপরন্তু সে কী করে?

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُسِسْكَ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ-

‘তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। ভাবতে থাকে, অপমান সত্ত্বেও কী একে রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফায়সালা করে, তা কতই না মন্দ!’ (১৬ : ৫৯)

সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে এবং কারও সাথে দেখা করে না। সে সামাজিক মেলামেশা করে না। কারণ, সে অত্যন্ত বিব্রত। লোকজন হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করবে— বলবে, ‘মাশাআল্লাহ।’ আর তাকেও হয়তো বাধ্য হয়ে জবাব দিতে হবে, ‘মাশাআল্লাহ।’ অথচ তার ভেতরটা কষ্টে পুড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ এই পুরো বিশ্বে মানসিকতাকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর আয়াতে ঐকে দেখিয়েছেন।

أَيُّسِرْكُ عَلَى هُوْنٍ- সে সময়ের মুশরিকরা এভাবেই ভাবত, ‘এতসব অপমানের পরও এই মেয়েটিকে কি আমি রেখে দেবো?’ সে সময় আরবরা যে নিকৃষ্ট কাজটি করত, যার কথা আয়াতে বলা হয়েছে। সন্তানটিকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। আর তার চেয়ে একটু ভালো বিকল্প ছিল মেয়েটিকে জীবন্ত রেখে দেওয়া, আর স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা। তারা ভেবে নিত, ‘আমি তাদেরকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেবো, কোনো দিন তাদের সঙ্গে কথা বলব না। ঘরের বাইরে খাবার দিয়ে আসব, কখনো দেখা করব না।’ এই মহিলারা পুরোপুরি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকত, যাকে **معلقة** বলা হয়েছে। সে কোথাও যেতে পারত না এই অপরাধে যে, সে একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে। এটা তারই ত্রুটি। কী ভয়াবহ এই দুই সিদ্ধান্ত!

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এত দূর যাই না। কিন্তু মনে রাখবেন, আল্লাহ শুধু জীবন্ত কবর দেওয়া বা সন্তানকে ত্যাগ করাকে অপরাধ বলছেন না। আল্লাহ গুরুত্ব দিচ্ছেন, মুখভঙ্গি থেকে শুরু করে বাকি সব আচরণকে। কুরআনের এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ কৃতকাজকে সমালোচনা করেন না, আল্লাহ আবেগকে সমালোচনা করেন। আল্লাহ সমালোচনা করেন মুখভঙ্গি—

ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ- ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ-

‘তারপর সে তাকাল। তারপর সে ক্রুদ্ধ হইল এবং মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পেছনে ফিরল এবং অহংকার করল।’ (৭৪ : ২১-২৩)

অর্থাৎ তার মুখভঙ্গিই তার ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এরপর আল্লাহ বলছেন—

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْبَثْلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট উদাহরণ, আর আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।’ (১৬ : ৬০)

মানুষের মধ্যে যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আল্লাহ এখানে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদেরকেও সেরকম কদর্য বলেছেন। যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায় না, তাদের চেয়ে অপছন্দনীয় আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। কল্পনা করা যায়? আমরা এই কাজটি করে একটুও দ্বিধাবোধ করি না। অথচ এটা আল্লাহর নির্দেশের একদম বিপরীত এবং তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করতে থাকার ফলেই এসব হচ্ছে।

এরপর আল্লাহ আবার তাদের কথায় আসছেন। আল্লাহ তাদের সাথে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বলছেন—

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ-

‘আর আল্লাহ যদি মানবজাতিকে তাদের জুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে (জমিনে) বিচরণকারী কাউকেই ছাড়তেন না। তবে আল্লাহ তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে, তারা একে এক মুহূর্ত পেছাতেও পারে না, এগোতেও পারে না।’ (১৬ : ৬১)

মানুষ ভুল করার সাথে সাথেই যদি আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতেন, তাহলে পৃথিবীর বুকে কোনো সৃষ্টিই টিকে থাকত না। এখানে যে অপরাধটির কথা বলা হচ্ছে, এর কারণে পুরো সৃষ্টিকুলকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। কিন্তু না, আল্লাহ বাড়তি সময় দিচ্ছেন। তাঁর নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত। কিন্তু যখন সে সময়টি এসেই পড়বে, তারা একে কোনোভাবে রদবদল করতে পারবে না।

এবার সে আয়াতে আসছি, যেখানে থেকে আমি শুরু করেছিলাম—

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ-

‘আর তারা যা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য শুভ পরিণাম আছে। সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং নিশ্চয়ই তারা সর্বাত্মে নিক্ষিপ্ত হবে।’ (১৬ : ৬২)

তারা নিজেদের জন্য যা অপছন্দ করে, তা আল্লাহর জন্য রেখে দেয়। অথচ এর বিনিময়ে সর্বোচ্চ পুরস্কারের মিথ্যে আশা করে। এর শাস্তি কেবল আগুন। আল্লাহ এদের সাথে রাগান্বিত হন। সুবহানাল্লাহ!

আসুন, আরেকটি বিষয়ে ভাবি। আমাদের মেয়েদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কী? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— **فاحسن اليهن** এবং **واتقى الله فيهن** অর্থাত্ আল্লাহর ভয়। মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বন করতে বলছেন। তাদের ব্যাপারে চিন্তা করার সময়, কথা বলার সময়, তাদের যখন বিয়ের চেষ্টা করবেন, সকল সময়ে আল্লাহকে ভয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি তার মেয়েকে এ ব্যাপারে জোর করল, ‘কেন বিয়ে করবে না? এই ছেলে পছন্দ করো বা না করো, আমাকে লজ্জিত করো না।’ এমনি করে নানাভাবে জোরাজুরি করতে থাকে। এই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা আসলেন এবং বললেন, তাঁর পিতা তাঁকে জোর করে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখন কী করবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, ‘এই বিয়ে বাতিল। এর কোনো অর্থ নেই।’ অথচ ভেবে দেখুন, কতভাবেই-না মুসলিম মেয়েদেরকে ভর্ৎসনা করে,

মানসিকভাবে চাপ দিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। কেন কথা শুনছ না, কেন আমাদের ছোটো করছ, এর চেয়ে ছেলে থাকলে ভালো হতো-ইত্যাদি আজীবাজে কথায় তাদেরকে বকাঝকা দেওয়া হয়।

এই ধরনের আচরণকে মাত্র একটি কথায় ইঙ্গিত করা হয়েছে- **فاحسن اليهن**, অথবা **اتقى الله**

فيهن অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, ‘আল্লাহকে স্মরণে রেখে তাদের সঙ্গে আচার-আচরণ করো। শেষ বিচারের দিনে তারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে কথা বলবে।’ আল্লাহ তাদের কিছু অধিকার দিয়েছেন। একজন ‘ওয়ালি’ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে আপনার কাজ তাকে কেবল উপদেশ দেওয়াই নয়; বরং তার অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা। পিতা হিসেবে আপনার আমার দায়িত্ব এটাই। শুধু আমাদের প্রশান্তি নয়, তাদের প্রশান্তি নিশ্চিত করতে হবে। এটাই হলো তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণে রাখা, আল্লাহকে ভয় করা।

কন্যাসন্তান আমাদের কাছে আমানাহ, সংরক্ষিত সম্পদ। তাদের সাথে আমরা কত কোমলভাবে কথা বলি? তাদের সাথে কতটুকু দয়াদ্রু আচরণ করি? আমার কাছে অনেক ইমেইল আসে। কেউ হয়তো বলে, ‘আমার বাবা আমাকে বলেন আমি মোটা, দেখতে কুৎসিত, আমাকে কেউ বিয়ে করবে না। আমি কিছুই বলতে পারি না কারণ, তিনি আমার বাবা। আমি কী করব?’ আমি জানি না এই মেয়েটিকে আমি কী বলব! শুধু তার বাবাকে বলতে চাই, ‘আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি আল্লাহর সামনে কীভাবে দাঁড়াবেন? সে আপনার পরিবারে জন্মেছে, একই ছাদের নিচে থাকছেন, সে আপনার অভিভাবকত্বে আছে, এর মানে তো এই না যে, আপনি তার মালিক। সে আল্লাহর মালিকানায় আছে। ঠিক যেমন আপনি আল্লাহর বান্দা তেমনি সেও আপনার কাছে আল্লাহর আমানাহ। আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটা শব্দের ব্যাপারে জবাব দিতে হবে।’

আপনার জন্য এটা জরুরি যে, আপনি কন্যাসন্তানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারেন। একইসঙ্গে আপনিই হবেন সর্বোৎকৃষ্ট পিতা। তাদেরকে ভালোবাসা দেখাবেন, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেবেন, তাদেরকে বিশ্বাস করবেন, তাদের প্রশান্তি নিশ্চিত করবেন। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কথা বলার আগে ভাববেন, **فاحسن اليهن واتقى الله فيهن** (তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- **ولم يؤثروا ولدَهُ عليها** - ‘সে তার পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর প্রাধান্য দেয় না।’ এর অর্থ তো আমরা জানি। আমার ছেলে বড়ো হচ্ছে, ওর জন্য আপনি কী কী করবেন, ভাবছেন। আপনার ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই বড়ো হচ্ছে, ভাবুন তাদের জন্য আপনি কী করবেন। কীভাবে তাদেরকে সঙ্গে রাখবেন।

ছেলেদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন? যান। এরপর মেয়েদের জন্য আবারও যাবেন। কারণ, আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই জান্নাত কামনা করেন, ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে আপনি বৈষম্য দেখাতে পারবেন না। উভয়ের জন্য আপনাকে একই সমান ভালোবাসা দেখাতে হবে। আমাদের

দ্বীন, ইসলামের এটাই সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যকে অস্বীকার করলে আমরা আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের জীবনকে দুর্বিষহ বানিয়ে ফেলব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে যার যার পরিবারের জন্য উত্তম পিতা, উত্তম ভাই এবং উত্তম অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা দান করুন। আমরা যেন কোনো দিন আমাদের কন্যাদের প্রতি দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতাকে ভুলে না যাই।

যে মেয়েরা এই লেখা পড়ছেন, দয়া করে আপনার বাবাকে দিয়ে বলবেন না, ‘এটা পড়ুন।’ আমরা শুধু নিজেদের সুবিধা হবে এমন লেখাই অন্যকে পড়াতে চাই। আমরা এ নিয়েই কথা বলা শুরু করেছিলাম। আমরা ভালো ব্যাপারগুলো নিজেদের জন্য বেছে নিই আর আল্লাহর জন্য রেখে দিই উচ্ছিষ্টগুলো। মানুষ এভাবেই ধর্মকে ব্যবহার করে। আল্লাহ এসব জানেন যে, কে কখন নিজের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে। এই দ্বীন, ইসলাম আপনার নিজের সুবিধার জন্য নয়। এ দ্বীন হলো আল্লাহর জন্য কাজ করা, নিজের জন্য নয়। আল্লাহ আপনাকে সুরক্ষা দেবেন, আপনার অধিকারকে সংরক্ষণ করবেন। একে নিজের পক্ষে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন না। এজন্য আয়াত এবং হাদিস থেকে শুনিতে নিজের লাভ আদায়ের চেষ্টা করবেন না।

বক্তৃতায় আমি অবশ্য এই কাজটি করি। কিন্তু ঘরে? আমি আমার স্ত্রী কিংবা সন্তানদের কাছে গিয়ে এই আয়াতগুলো শুনিতে দেবো না, তাদেরও এটি করা উচিত নয়। দ্বীন কেবল তর্কবিতর্ক করে জয়ী হওয়ার হাতিয়ার নয়। এভাবে দ্বীনকে অপব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমরা এটাই করি। মেয়ের ওপর আপনার সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিয়ে কুরআন এবং হাদিসকে ব্যবহার করবেন না।

অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর হাদিসের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের হৃদয়গুলোকে আমাদের পরিবার এবং বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের জন্য নমনীয় করে দিন। আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম ছেলে এবং মেয়েসন্তান তৈরির যোগ্যতা দিন, যারা ইসলামের সৌন্দর্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে।